সুখের দিন ছিল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

॥ ১ ॥

আজও মনে আছে সেই দিনটির কথা। যেদিন অতনু প্রথম এসেছিল আমাদের বাড়িতে। উঠোনের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল আড়ষ্টভাবে। রোগা পাতলা চেহারা, ন্যাড়ামাথা, বছর চোদ্দ বয়েস। অতনুর সঙ্গে একটা সুটকেশ আর সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। ও এসেছিল ওর কাকার সঙ্গে। তিনি আবার রীতিমতন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী।

কয়েকদিন পরেই আমার পরীক্ষা। পরীক্ষার ভয়ে আমার রীতিমতন শীত ধরে গিয়েছিল। চেয়ারের ওপর পা তুলে উবু হয়ে বসে দুলে দুলে জ্যামিতি মুখস্ত করছিলাম, আওয়াজ শুনে বাইরে এলাম।

অতনুকে নিয়ে ওর কাকা আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই মা চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। আমি দেখেছিলাম দিদির চোখও ছলছল করছে। বাবার মুখ গম্ভীর। এমন কি সন্ন্যাসীটি পর্যন্ত চোখ মুছলেন চাদরের খুঁট দিয়ে। অতনুর চোখ শুকনো, সে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে।

এক সময় বাবা অতনুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমাকে বললেন, বাপ্পা, ওকে ঘরে নিয়ে যা। ও তোর মাসতুতো ভাই হয়।

তখন মনে পড়লো, মাসখানেক আগে আমরা বাড়িতে তিনদিন নিরামিষ খেয়েছিলাম। চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের এক মাসী মারা গেছেন, মা সেদিনও খুব কেঁদেছিলেন। তখনকার দিনে বাঙালী মেয়েরাও খুব চেঁচিয়ে কাঁদতো।

অতনুর মা যদিও আমার আপন মাসী হন, কিন্তু তাঁকে আমি দেখিনি। শুনেছিলাম, দিদির একবার যখন খুব অসুখ হয়, তখন তিনি এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কিন্তু সে সময় আমি এতই

ছোট যে তা আমার মনে থাকবার কথা নয়। মার মুখে অনেকবার শুনেছি, সেই মাসীর সেবাতেই নাকি সেবার দিদি বেঁচে উঠেছিল। তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক গল্প শুনেছি। তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব ভালোবাসতেন। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলেই তিনি ডেকে এনে কিছু না কিছু খাবার দিতেন। অতনুর মা, আমাদের সেই মাসীর নাম সতীমাসী। মাত্র তিন দিনের জ্বরে ভোগার পর তিনি অতনুকে ফেলে রেখে মৃত্যু নামে এক ভয়ংকর রহস্যময় জায়গায় চলে গেলেন। এরকম নিষ্ঠুর কাজ তিনি জীবনে আর কখনো করেন নি।

আমরা এ-ও শুনেছিলাম, আমাদের সেই সতীমাসীর বর খুব গরীব। এক সময় তিনি দেশের কাজ করার জন্য জেল খেটেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কোনোদিন সরকারি কাজ করবেন না। তাই বর্ধমানের কোন এক গ্রামে একটা ছোট্ট স্কুলে মাস্টারি করেন। আমার মা অনেকবার সতীমাসীকে কাশীতে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু ওঁদের টাকা নেই বলে আসতে পারেন নি। অবশ্য সতীমাসীরা কতখানি গরীব সে কথা বোঝার ক্ষমতা ছিল না আমার তখন। আমার ধারনা ছিল, পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে গরীব। আমাদের বাড়িতে সব সময় একটা নেই-নেই ভাব। অন্যদের বাড়িতে প্রত্যেক বেস্পতিবার লক্ষ্মী পুজোর পর সন্দেশ প্রসাদ থাকে, আমাদের বাড়িতে শুধু বাতাসা। আমরা বাড়িতে কখনো এক টুকরোর বেশী দু'টুকরো মাছ খাইনি। আমার ঠিক দুটো জামা আর দুটো প্যান্ট। ইস্কুলে টিফিনে কিছু খাবার জন্য আমি কোনদিন পয়সা পাইনি। আমার বন্ধু অজয় টিফিনে চার আনা খরচ করে। একদিন বাড়িতে রাবড়ি খেতে চেয়েছিলাম বলে বাবা আমার কান ধরে চড় মেরেছিলেন। বলেছিলেন, এখন থেকেই অত বাবুগিরির শখ। তখন কাশীতে চার পয়সায় এক খুড়ি রাবড়ি পাওয়া যেতো।

অতনু আমার মাসতুতো ভাই, কিন্তু ওকে দেখার আগে ওর নামটাও আমি জানতাম না। ঘরে ডেকে এনে আমি ওর নাম জানতে চাইলাম। ও শুধু নিজের নাম বলেই চুপ করে রইলো, আমার নামটাও জানতে চাইলো না। যেন বেশী কথা বলার কোনো রকম উৎসাহ ওর নেই। মুখ ক্লান্ত আর বিষণ্ণ।

পড়ার ঘরে আমার মাস্টার মশাইয়ের চেয়ারটাতে অতনুকে বসতে দিলাম। হাফ প্যান্টের নীচে দুটি রোগা রোগা পা ঝুলিয়ে অতনু বসে রইলো চুপ করে। কোনো কথা বলে না। ন্যাড়ামাথার জন্যই ওকে আরও বেশী গো বেচারার মতন দেখায়। আমিও কথা বার্তা বিশেষ না বলে পড়ায় মন দিলাম। মাসীমা মারা গেছেন বলে তো আমার পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে না। মাস্টার মশাইরা খাতায় গ্রেস নম্বরও দেবেন না।

পরে জেনেছিলাম, অতনুর বাবা, অর্থাৎ আমাদের মেসোমশাই, আগেই মারা গেছেন। অতনু একদম একা। ওর দুই কাকাই সন্ন্যাসী।

খেয়ে দেয়ে আমি চলে গেলাম ইস্কুলে। বিকেলে ফিরে এসে দেখি, অতনু আমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। আমার মোটেই সেটা পছন্দ হলো না।

খাবার ঘরে গিয়ে মাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, মা, ও কতদিন থাকবে?

মা বললেন, কতদিন আবার কি? ওর কি আর কোনো থাকার জায়গা আছে? ও এবাড়িতেই থাকবে এখন থেকে।

—ও কি আমার বিছানায় শোবে নাকি?

—কেন, তোরা দুই ভাই বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকবি, ভালোই তো।

—কিন্তু ও তো বিছানা এনেছে।

—আর তো খাট নেই বাড়িতে।

—তাহলে মাটিতে বিছানা পেতে…

মা হঠাৎ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ, নিজের ভাইকে তুই মাটিতে শুতে বলছিস! কক্ষণো এরকম নীচু মনের পরিচয় দিতে নেই!

মার কাছ থেকে সেই প্রথম আমি এ রকম কড়া বকুনি খেলাম। এবং যেহেতু সেটা অতনুর কারণে, তাই মনটা আমার ওর ওপরেই বিরূপ হয়ে উঠলো। একটা ন্যাড়ামাথার হ্যাংলা ছেলে আমার পাশে শুয়ে থাকবে, এটা ভাবতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।

মা পরোটা ভাজছিলেন। সেগুলো প্লেটে সাজিয়ে বললেন, যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। শোনো, ওর মা নেই, বাবা নেই, কক্ষণো ওর মনে ব্যাথা দিয়ে কোনো কথা বলবে না। ওকে বন্ধু করে নেবে। ও যেন কোনোদিনও বুঝতে না পারে…

তখন আমরা কাশীতে থাকতাম। বাবা কাজ করতেন রামনগর এস্টেটে। দিদির সেই সময় বিয়ে হবো হবো দিন চলছে। আমার দিদির মতন নিষ্ঠুর মেয়ে আমি আর দেখিনি।

আমাদের বাড়িতে টাকা পয়সার অভাব ছিল, কিন্তু মায়ের স্নেহের কোনো অভাব ছিল না। মায়ের জন্যই কোনো কষ্টই আমার কাছে কষ্ট বলে মনে হতো না। মা আমাকে আলাদা ডেকে বলে দিলেন, পৃথিবীতে আমরা ছাড়া অতনুকে দেখবার আর কেউ নেই, সুতরাং অতনুকে যেন আমি সব সময় নিজের ভাইয়ের মতন দেখি। তখন আমার মনে হয়েছিল, অতনু আমার মায়ের স্নেহে ভাগ বসাতে এসেছে।

জলখাবার খেয়ে অতনুকে নিয়ে অজয়দের বাড়ি গেলাম। অতনুদের বাড়ি ছিল বর্ধমানের এক গ্রামে। অমি তখন পর্যন্ত দু'বার মাত্র কলকাতা দেখেছি। ব্যারাকপুরে আমার জন্ম হলেও বাংলাদেশের গ্রাম কী রকম দেখতে হয় আমি জানি না। অতনুও আগে কখনো কাশীতে আসেনি। বাঙালীটোলার রাস্তায় বড্ড ভিড়,

টাঙ্গা আর সাইকেল সব সময় যেন গায়ের ওপর এসে পড়ছে। আমি অতনুর হাত ধরে রইলাম। ছেলেটা তখনও বিশেষ কথাবার্তা বলে না।

অজয়দের বাড়িটা প্রকাণ্ড বড়। সামনে মস্তবড় লোহার গাঁট বসানো দরজা, যাকে ওরা বলে সদর দেউড়ি। একতলায় অনেক-গুলো ঘর পড়ে আছে, কেউ থাকে না। চোর চোর খেলার সময় এর মধ্যে দু'একটা ঘরে একা ঢুকে পড়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এরকম ঘর কেন বানিয়েছিল কে জানে!

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেলে অজয়ের ঘর। অজয় তখন ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। ছাদের পেছন দিকের পাঁচিলে তিনটে বাঁদর বসে চোখ পিটপিট করছে। প্রায়ই এই বাঁদরগুলোর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়।

অজয় প্যাঁচ খেলছিল শিউপূজনের সঙ্গে। শিউপূজনটা অতি ধুরন্ধর। আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বলার সময় নেই অজয়ের। লাটাইটা ফেলে দিয়ে দু'হাতে চড়চড় করে টানছে। তবু অজয়ের ঘুড়িটাই কেটে গেল। মিঠাই মহল্লার বাড়ির ছাদে শিউপূজন লাফাতে লাফাতে চিৎকার করতে লাগলো, খেলো গে! আউর খেলো গে! সেই সঙ্গে সঙ্গে চাপড় মারতে লাগলো নিজের উরুতে। ওরকম উরু চাপড়ায় বলে আমরা ওর নাম দিয়েছি দুর্যোধন।

অজয় রেগে গেছে। হাত্তা গুটিয়ে এনে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এই অপয়াটাকে আবার কোথ্থেকে আনলি?

অতনু তখন ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখছে। ও যাতে অজয়ের কথা শুনতে না পায় তাই আমি অজয়কে আমার দিকে ফিরিয়ে বললাম, ও আমার মাসতুতো ভাই, ওর নাম অতনু।

তারপর অতনুর গুরুত্ব বাড়াবার জন্য বর্ধমানের কথা উল্লেখ না করে বললাম, কলকাতা থেকে এসেছে।

তখনও কলকাতার ছেলেদের আমরা সমীহ করি।

অজয় বললো, ন্যাড়ামুণ্ডি দেখলেই আমার দিনটা খারাপ যায়। ওর জন্যই তো ঘুড়িটা কাটলো।

তারপর অতনুকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই, এই, পাঁচিলের কাছে যাস নি! বাঁদরের চাঁটি খাবি।

কথাটা অজয় মিথ্যে বলে নি। একদিন আমি একটা বাদামের ঠোঙা নিয়ে ছাদে উঠেছিলাম, একটা গোদা বাঁদর পেছন থেকে এসে আমার গালে এক চড় মেরে বাদামগুলো কেড়ে নিয়েছিল।

আমি বললাম, অতনু এদিকে সরে এসো।

আমি হুস্ হুস্ করে বাঁদরগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। ওরা অলস ভাবে একটুখানি সরে বসলো মাত্র। হাতে লাঠি ফাঠি না থাকলে ওরা একটুও ভয় পায় না।

অতনু কাছে আসবার পর অজয় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বাঃ, বেশ কচি লাউয়ের মতন তো!

তারপরই চটাং করে এক চাঁটি মেরে অজয় হাসতে লাগলো।

ন্যাড়ামাথা দেখলে আমারও চাঁটি মারতে ইচ্ছে করে। তা বলে নিজের মাসতুতো ভাইকে তো মারতে পারি না।

অতনু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অজয়ের দিকে। মনে হলো যেন ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে। অজয় একটু নিষ্ঠুর ধরনের ছেলে। অতনু যদি কেঁদে ফেলে, তা হলে অজয় মজা পেয়ে গিয়ে ওকে আবার মারবে, আমি জানি। অতনু কিন্তু কাঁদলো না, সেই রকম এক দৃষ্টেই চেয়ে রইলো। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কিছু মনে করো না, অজয় খুব ভালো ছেলে।

অজয় ওকে জিজ্ঞেস করলো, তুই ঘুড়ি ওড়াতে জানিস?

অতনু বললো, না।

—কলকাতার ছেলে হয়ে ঘুড়ি ওড়াতে জানিস না?

তাড়াতাড়ি কথাটা ঘোরাবার জন্য বললাম, জানিস, অতনু এখন থেকে বেনারসেই থাকবে, আমাদের বাড়িতে—

অজয় অতনুর হাতে লাটাইটা তুলে দিয়ে বললো, এটা ধর। অত শক্ত করে না রে বুদ্ধুরাম, একটু আলগা করে ধরতে হয়—

হঠাৎ আমি একটা জিনিস টের পেলাম। অন্যদিন ঘুড়ি কেটে গেলে অজয় আমার ওপর রেগে যায়। আমার মাথায় চাঁটি মারে। আর লাটাই তো আমাকেই ধরতে হয় প্রত্যেকদিন। অজয়ের গায়ের জোর সকলের চেয়ে বেশী। ওর ভীষণ মেজাজ। ইস্কুলের সব ছেলে ভয় করে অজয়কে। কিন্তু আজ থেকে আমি বেঁচে গেলাম। এখন থেকে লাটাই ধরবে অতনু, অজয়ের রাগের ঝালও ওকেই সইতে হবে। গোপনে একটু খুশী হয়ে উঠলাম।

অজয় নতুন একটা ঘুড়ি চড়াই করবার জন্য পাঁচিলের পাশে এনে ঝোলালো। তারপর বললো, দেখেছো, দেখেছো মুন্নিটার কাণ্ড। এই মুন্নি, নাব্ নাব্—

আমিও এসে উঁকি মেরে দেখলাম। মুন্নি পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশে কাপড় শুকোবার তার বাঁধছে।

মুন্নিদের বাড়িটা দোতলা। মুন্নি আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হলেও শাড়ি কিংবা ফ্রক পরে না। প্যান্ট সার্টই পরে বেশী। অতি দুর্দান্ত মেয়ে।

আমি বললাম, এই মুন্নি নাব্ ওখান থেকে, পড়ে যাবি।

মুন্নি আমাদের দিকে মুখ উঁচু করে অবহেলার সঙ্গে বললো, যা যা।

অজয় বললো, ঢেলা মারবো কিন্তু। বাদলাকে ডাকবো?

মুন্নি আমাদের কথা গ্রাহ্যই করলো না। আরও সাহস দেখাবার জন্য, তারটা বাঁধা হবার পরেও ও পাঁচিলের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। দেখলেই ভয় করে।

অজয় একটা ছোট ঢিল কুড়িয়ে মুন্নির দিকে টিপ করে মারলো। মুন্নি হাত দিয়ে মাথাটা আড়াল করে বললো, ভালো হবে না কিন্তু, আমিও মারবো।

অজয় আমাকে বললো, বাপ্পা, আরও কয়েকটা ঢিল জোগাড় কর তো।

আমরা দু'জনেই টুপটাপ করে ঢিল মারতে লাগলাম মুন্নিকে। মুন্নি লাফিয়ে নীচে নেমে পড়তে বাধ্য হলো। তারপর ঢিল ছোঁড়ার চেষ্টা করলো আমাদের দিকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারলো না। ওদের ছাদ নীচে। আমরা ইচ্ছে করলেই পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়তে পারি। মুন্নি তা পারে না। ঢিল মেরে মেরে আমরা মুন্নিকে ছাদ থেকে তাড়ালাম।

অজয় তখন সন্তুষ্ট মনে ঘুড়িটা ওড়ালো। শিউপুজন আবার চ্যাঁচাচ্ছে, আও পাঠ্যে। চলে আও পাঠ্যে।

এবার শিউপুজনকে কাটতেই হবে।

অতনুর হাতে লাটাই, অজয় ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আমার ভূমিকা এখন উপদেষ্টার। আমি বললাম, আর একটু নীচে পড়, লাট খা, লাট খা, এবার টান—

কিন্তু প্যাঁচ শেষ হবার আগেই একটা বিপদ ঘটলো।

মুন্নি হঠাৎ চলে এসেছে এ ছাদে। প্রতিশোধ নিতে। দু'হাতে মুঠো করা কি যেন জিনিস, ছাদের মাঝখান পর্যন্ত চলে এসে ভয় দেখিয়ে বলতে লাগল, এবার, এবার!

মুন্নিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার আগেই সে হাতের জিনিসগুলো ছুঁড়ে মারলো আমাদের দিকে। ছোট ছোট কাঁকরের মতন কি যেন আমরা চোখ বুজে মুখ নীচু করলাম। তারপর চোখ খুলে দেখি কাঁকর তো নয়, শুধু দুমুঠো শুকনো ছোলা। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। চক্ষের নিমেষে, আরও কতকগুলো বাঁদর এসে জুটলো।

উঃ কি শয়তান মেয়ে। বাঁদর দিয়ে আমাদের মার খাওয়াতে চায়। ঘুড়ি লাটাই ফাটাই ফেলে আমরা দৌড় মারলাম।

ছাদের ওপরেই অজয়দের ঠাকুরঘর। ঠাকুরের প্রসাদ কলা আর

গুজিয়ার লোভেই বাঁদরগুলো আসে। ঠাকুরঘরে একটা লোহার ডাণ্ডা রাখা আছে। সেটা এনে অজয় বাঁদরগুলোকে তাড়া করে গেল। ছোটোখাটো একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল প্রায়। বাঁদররা শেষ পর্যন্ত পালালো ঠিকই, কিন্তু তার আগে প্রতিটি ছোলার দানা নিয়ে গেল খুঁটে খুঁটে।

অতনু তো এই সব দেখেশুনে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বাঁদরের ভয়ে ছুটতে গিয়ে অতনু আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। আমার ভয় করছিল, পড়ে গিয়ে বেচারির ন্যাড়া মাথাটা আবার ফটাস করে ফেটে না যায়। তা যায় নি অবশ্য, তবে হাঁটুর কাছে ছড়ে গেছে অনেকখানি।

অজয়ের ঘুড়ি এর মধ্যে গোঁৎ খেয়ে পড়ে গেছে। ছিঁড়েও দিয়েছে কে। অজয় রাগে একেবারে গরগর করছে। আমার দিকে চোখাচোখি করে বললো, আয়!

আমরা দু'জনে ছাদের সিঁড়ির দরজার দুপাশে লুকিয়ে দাঁড়ালাম। জানতাম, মুন্নিটা ঠিক সিঁড়িতে তখনো লুকিয়ে থাকবে। সবটুকু মজা না দেখে সে যাবে না। ধরতে গেলেই পালাবে।

অজয় চেঁচিয়ে বললো, কেটে গেছে? ইস্ কতটা কেটে গেছে? দেখি দেখি—

আমি বললাম, রক্ত বেরুচ্ছে, দারুণ রক্ত বেরুচ্ছে—

এইসব কথা শুনে মুন্নি আর কৌতুহল দমন করতে পারবে না। ঠিক দেখতে আসবে।

মুন্নি যেই দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে মাথাটা বাড়ালো, অমনি আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে ক্যাঁক করে চেপে ধরলাম ওকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে এলাম ঠাকুরঘরের পাশে।

অজয় বললো, তুই আবার আমাদের ছাদে এসেছিস? তোকে কতবার বারণ করেছি না।

মুন্নি বুনো প্রাণীর মতন ছটফট করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। অজয়ের কথা শুনে বললো, বেশ করবো।

—না আসবি না! এলে তোকে মেরে তাড়াবো!

—মার না দেখি!

—তুই আমাদের সঙ্গে খেলতে এলে তোর বাবা আমাদের বকে কেন শুধু শুধু?

—আমি তার কি জানি।

—আমরা তোর সঙ্গে খেলতে চাই না—

—আমারও বয়ে গেছে তোদের সঙ্গে খেলতে। আমাকে ইঁট মেরেছিলি কেন?

আমি ছেড়ে দিয়েছি মুন্নিকে। অজয় ওর একটা হাত পিঠের দিকে মুচড়ে ধরে আছে। আর পালাবার উপায় নেই। নিশ্চয়ই খুব ব্যাথা পাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ও কাঁদবে না।

মুন্নির চুলগুলো ঘাড়ের একটু নীচে ছেঁটে ফেলা। ওর এই রকম ছেলেদের মতন সেজে থাকা আর দস্যিগিরির জন্য বাড়িতেও দারুণ বকুনি খায়। তবু গ্রাহ্য করে না। মুন্নির বাবা বিখ্যাত পণ্ডিত। এখনো তাঁর নাম শুনলে ভারতবর্ষের অনেকে চিনতে পারবে। তাঁর মেয়ে ঐ রকম।

অজয় বললো, আমাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চা, না হলে তোকে ছাড়বো না।

—আমার বয়ে গেছে ক্ষমা চাইতে।

অজয় ওর হাতটা মোচড়ালো আর একটু। তারপর আমাকে বললো, বাপ্পা, ওর মাথাটা আমার পায়ের ওপর চেপে ধর তো!

আমার ঠিক সাহস হলো না। মুন্নির সাংঘাতিক মেজাজ। এরপর আবার কখনো সুযোগ পেয়ে আমাদের ওপর কী রকম প্রতিশোধ নেবে কে জানে।

আমি বললাম, অজয়, ছেড়ে দে, আজকের মতন ওকে ছেড়ে দে—

অজয় বললো, না ছাড়বো না। বড্ড জ্বালায় আমাদের। যদি এই ন্যাড়ামুণ্ডি ছেলেটাকে আজ বাঁদরে কামড়ে দিত?

অতনু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে মুন্নির দিকে। এখনও একটাও কথা বলছে না।

আমি অজয়দের দিকে চোখের ইসারা করে বললাম, ছেড়েই দে, আজকে।

অজয় মুন্নির হাতের প্যাঁচ কমালো। তারপর বললো, আমার সেনাপতি বাপ্পাদিত্যের অনুরোধে তোকে আজ ছেড়ে দিলাম, যাঃ!

মুন্নি সোজা হয়ে বসে এক হাত দিয়ে ওর ব্যাথা-লাগা অন্য হাতটাকে আদর করলো। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই এক চড় কষালো অজয়ের গালে।

আবার মারামারি বেঁধে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি মাঝখানে এসে থামালাম। নিশ্চয়ই অজয় মুন্নির হাত বেশ জোরে মুচড়ে দিয়েছিল, তাই মুন্নির রাগ পড়েনি।

অজয় বললো, আমরা কিছুতেই ওর সঙ্গে মিশতে চাই না, তবু ও আসবেই আসবে। মহা জ্বালাতন দেখছি মেয়েটাকে নিয়ে।

আমিও বললাম, মুন্নি, ভাই তুমি আমাদের সঙ্গে আর মিশবে না। তখন মুন্নি কাঁদতে বসলো।

মুন্নির এই কান্নাকে আমরা আরও বেশী ভয় পাই। কান্না মুন্নিকে মানায় না। কিন্তু ও যখন কাঁদতে শুরু করে একবার, তখন আর কিছুতেই থামে না। অজয়ের মা যদি এই কান্না শুনে ওপরে চলে আসেন, তাহলেই হয়েছে আর কি। সবাই আমাদের দোষ দেবে। মুন্নির দাদা বাদলদা তো যখন তখন আমাদের বকেন।

অজয়ও ভয় পেয়েছে, তবু গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, মুন্নি, লক্ষ্মীটি, কাঁদিস না। আচ্ছা, আর কোনদিন বকবো না। সত্যি বলছি, তোকে আর মারবো না। চুপ চুপ, আর কাঁদে না—

মুন্নি ততক্ষণে গলা চড়াতে শুরু করেছে। এইবার ওর কান্নার আওয়াজ ঠিক নীচে পৌঁছোবে। মেয়েটা কি কম শয়তান! অজয়ের মাকে দিয়ে বকুনি না খাইয়ে ছাড়বে না। ইচ্ছে করলো, মুন্নির গলা টিপে দি।

তবু কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলাম, মুন্নি, এবারের মতন চুপ কর···সত্যি বলছি, আর কোনোদিন···অজয় মেরেছে, আমি তো তোকে মারিনি, আমার কথা শোন······

অজয় বললো, কাঁদুক না যত ইচ্ছে, মা বাড়িতে নেই, রামায়ণ শুনতে গেছেন।

লক্ষ্য করিনি, কখন অতনু সরে গেছে সেখান থেকে। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার ফোঁপানো কান্না শুনতে পেয়ে আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে গেলাম।

সেই সময়, অতনুর জন্য আমার কষ্ট হলো খুব। এর আগে আমি গুরুত্বটা ঠিক বুঝিনি। আমারই মতন একটা ছেলে অথচ তার মা আর বাবা দুজনই নেই, এ যে কতখানি শূন্যতা, তা আমি বুঝবো কি করে?

আমাদের বাড়িতে অতনু যখন আসে তখন সবাই কাঁদছিল, কিন্তু অতনু কাঁদেনি। এখন তার কান্না পেয়ে গেল কি মুন্নির কান্না দেখে? মুন্নির কান্না দেখে কি তার কষ্ট হয়েছে? মুন্নির কান্না তো নকল। অবশ্য, এর পরেও আমি অনেকবার দেখেছি, মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসে অতনু নিঃশব্দে কাঁদছে।

মুন্নি অবাক হয়ে কান্না থামিয়ে দিয়েছে। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওর কি হয়েছে?

আমি চট্ করে কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

অজয় এগিয়ে গিয়ে অতনুর কাঁধে হাত দিয়ে বললো, এই, তুই আবার ফ্যাঁচফ্যাঁচ শুরু করে দিলি কেন?

আমার ভয় হলো, অজয়ের যা কাঠখোট্টা স্বভাব, ও যদি এই সময় আবার অতনুর মাথায় চাঁটি মারতে শুরু করে?

অজয় অবশ্য তা করলো না। অতনুকে ধরে এনে ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে বসালো।

আমি মুন্নিকে বললাম, ওর নাম অতনু, আমার মাসতুতো ভাই হয়।

মুন্নি বললো, মাথা ন্যাড়া করেছে কেন? উকুন হয়েছিল?

—না, ওর মা মরে গেছে।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, ওর বাবাও মরে গেছে।

অজয় চমকে আমার দিকে তাকালো। যেন এইকথাগুলো আগে ওকে না বলে দেবার জন্য আমি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এ কথা আমি ওকে না বলে মুন্নিকে বললাম কেন?

মুন্নি বললো, ওর বাবাও নেই? তা হলে তো ওকে বকুনি দেবারও আর কেউ নেই! বেশ মজা!

এই প্রথম অতনু পুরো একটা বাক্য উচ্চারণ করলো। চোখের জল মুছতে মুছতে সে বললো, আমার বাবা কক্ষণো আমাকে বকতেন না।

—তোমার মা?

—আমার মাও কখনো আমাকে বকেন নি।

যে বাবা-মা কখনো বকে না, শুধু ভালোবাসে, তারা কেন তাড়াতাড়ি মরে যায়? আমাদের বাবা-মা আছে, অতনুর নেই। অতনু আমাদের থেকে আলাদা।

মুন্নি তবু বললো, এমা, ওর বাবা—মা কেউই নেই, তা হলে ওর কী হবে?

অজয় মুন্নিকে এক ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর তো! অতনু এখন থেকে রোজ আমাদের সঙ্গে খেলবে।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। আকাশে শোনা যাচ্ছে ঘরে-ফেরা পাখিদের ডাক। দূরে একটা মন্দিরে আরতির কাঁসরঘন্টা বেজে উঠলো। এক্ষুনি বাড়ি ফিরে পরীক্ষার পড়া নিয়ে বসতে

হবে। তবু আমরা কিছুক্ষণ ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে বসে গল্প করতে লাগলাম। আমরা শুনতে লাগলাম অতনুর বাবা মার কথা। ঠিক যেন রূপকথার মতন। মুন্নিরই বেশী আগ্রহ।

আমরা কেউ বাংলাদেশের গ্রাম দেখিনি। সেখানে পাথর নেই, শুধু মাটি। বর্ষায় কাদা জমে। সরু রাস্তায় পাশে পাশে অনেক গুলো পুকুর। একটা বিরাট বটগাছের নীচে শ্মশান। তার পাশ দিয়ে ইস্কুলে যেত অতনু। ওদের ইস্কুলে টিনের ঘর। একদিন খুব বৃষ্টিতে অতনুদের বাড়ির উঠোনে জল জমে গিয়েছিল, আর তার মধ্যে খলখল করছিল কই মাছ। খুব বর্ষার সময় কই মাছ নিজে নিজে পুকুর থেকে ওপরে উঠে আসে।

এসব আমাদের কাছে একদম নতুন কথা।

আজও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। সেই ম্লান আলোয় ছাদের ওপর বসেছিলাম আমরা চারজন, ন্যাড়ামাথা অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, ওর চোখের পল্লবগুলো অনেক বড়। মুন্নির ছোট করে ছাঁটা চুল। প্যান্ট-সার্ট পরা। অজয়ের হাফ প্যান্টের নিচে পা দুটো বেশী লম্বা দেখায়। আর আমার ঠোঁটের ওপরে সদ্য একটু একটু গোঁপের রেখা দেখা দিয়েছে। আমরা চারজনেই অল্পক্ষণের মধ্যে খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

সেদিন আমরা ভাবতেই পারিনি, কিছুদিনের মধ্যেই মুন্নির সঙ্গে আমাদের তিনজনের সম্পর্ক কত জটিল হয়ে যাবে।

॥ ২ ॥

আমাদের তখন পরীক্ষার সময়। কিন্তু অতনুর কোনো পড়াশুনো নেই। নভেম্বর মাসের শেষ এসে পৌঁছেচে বলে অতনু ইস্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ওর বেশ মজা।

ভোর পাঁচটার সময় বাবা আমাকে ডেকে তুলে দেন। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠি। চোখের পাতায় যেন গঁদের আঠা লাগানো, কিছুতেই চোখ খুলতে চায় না। চোখ বুজেই চলে যাই বারান্দায়। বালতিতে রাত্তির থেকেই জল রাখা থাকে। সেই জল সারা রাত বারান্দায় খোলা থেকে এত ঠাণ্ডা হয়েছে যে ছুঁলেই মনে হয় যেন হাত কেটে যাচ্ছে। সেই জল চোখে ছেটাতে ছেটাতে রোজই মনে হতো, হে ভগবান, কবে ইস্কুলটা পার হবো। সামনের বছরেই আমাদের টেস্ট পরীক্ষা—এই একটা বছর যদি কোনোক্রমে লাফিয়ে পার হওয়া যেত!

সেই সময় মনে হবে, পরীক্ষাটাই যেন আমাদের জীবনের প্রধান শত্রু। কোনোক্রমে এই শত্রুটাকে জয় করতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই।

আমার বাবার কোনরকম শীত বোধ নেই। ভোর পাঁচটায় উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। সেই সময় সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতেন অজস্র, কোনোদিনও তাঁর গলা একটু কাঁপতে শুনিনি।

আমাকে চা দেওয়া হতো না। ইস্কুলের ছেলেরা চা খেলে তাদের নাকি ব্রেন খারাপ হয়ে যায়। সাতটার সময় ছোটেলাল দুধ দিয়ে গেলে আমি গরম কিছুর স্বাদ পেতাম।

বাবা বেরিয়ে যেতেন সকাল সাড়ে ছ'টায়। সেই সময় পর্যন্ত

আমাকে চিৎকার করে করে পড়তে হতো। বাবার ধারণা ছিল, চিৎকার করে না পড়লে মোটেই পড়া হয় না। কখনো ঘুমে চোখ ঢুলে এলে বাবা পাশের ঘর থেকে হুংকার দিতেন, কি হলো, বাপ্পা?

আমি ধড়মড়িয়ে সজাগ হয়ে উত্তর দিতাম, এই তো একটু মনে মনে বুঝে নিচ্ছি।

বাবা বলতেন, মনে মনে বোঝা হচ্ছে না ঘেঁচু। ফেল করলে আর কেঁদেও কুল পাবি না। তখন চায়ের দোকানে বেয়ারা হয়ে জীবন কাটাতে হবে।

চায়ের দোকানে বেয়ারাগিরিই ছিল আমার বাবার মতে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কাজ। আমার অবশ্য ভাবতে খুব খারাপ লাগতো না ব্যাপারটা।

নসিয়রঙের আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আমি দুলে দুলে চিৎকার করে পড়তাম ভোরবেলা। সেই সময় পাশের বিছানাতেই অতনু ঘুমিয়ে থাকতো। দেখে রাগ হয় না? ইচ্ছে হতো, এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ওর মাথায় ঢেলে দিই। কিন্তু ওর মা-বাবা নেই, ওকে কিছু বলা যাবে না।

আমি পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছিলাম না। গল্পের বই পড়ার দারুণ নেশা ছিল, কিন্তু পড়ার বই ছুঁতে ইচ্ছে করতো না। অঙ্কে একদম মাথা ছিল না। বিশেষত জ্যামিতিটা আমার অখাদ্য লাগতো। তবু কোনরকমে সব পরীক্ষায় পাশ করে যেতাম। তখন এই ধারণাই ছিল না যে জীবনে উন্নতি করতে গেলে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে হয়। তখন ভাবতাম, যারা ঘুড়ি ওড়ায় না, যারা খেলাধুলো করে না, বাড়ির কারুকে না বলে যারা গঙ্গায় নৌকা চড়তে যায় না, তারাই শুধু ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। যেমন শশাঙ্ক কিংবা প্রাণজ্যোতি। প্রাণজ্যোতি সারা বছর অসুখে ভুগতো। কিন্তু পরীক্ষার সময় ঠিক ফার্স্ট হয়ে যেত।

গোলাপ ফুল আঁকা টিনের বাক্সে অতনু ওর জামা কাপড়ের সঙ্গে কিছু বই পত্রও এনেছিল। ওর বর্ধমানের ইস্কুলের বই অবশ্য কাশীর ইস্কুলে কোনো কাজেই লাগবে না। পড়ার বই ছাড়া ওর আর দুখানা বই ছিল, কথা ও কাহিনী আর আশ্চর্যদ্বীপ। ঐ আশ্চর্যদ্বীপ বইটা আমার না-পড়া, ওটা শেষ করার জন্য আমার বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতো। কিন্তু পরীক্ষার আগে গল্পের বইতে হাত দিলে বাবা আমাকে আস্ত রাখতেন না।

সকাল আটটা নটার সময় জলখাবার-টাবার খেয়ে অতনু ওর সেই বই দুখানি নিয়ে দেয়ালের কাছে পা ছড়িয়ে পড়তে বসতো। আমি নিশ্চয়ই সেই বয়সে খুব হিংসুটে ছিলাম, নইলে অতনুকে অত হিংসে হতো কেন আমার?

অবশ্য, দুপুরবেলা, মা ঘুমিয়ে পড়বার পর অতনুর কষ্টের সময় শুরু হতো।

বাড়িতে থাকার চেয়ে ইস্কুলে যাওয়ার আকর্ষণটাই আমার কাছে বেশী ছিল। ইস্কুলে কত বন্ধু, কত মজা। বাড়িতে থাকা মানেই তো বকুনি খাওয়া। আর ছিল দিদির অত্যাচার। এখন তার ঠ্যালা সামলাতে হলো অতনুকে।

ইস্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের পর দিদিকে আর পড়ানো হয়নি। মেয়েদের কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাবা অতদূরে দিদিকে পড়তে পাঠাতে রাজি হননি কিছুতেই। দিদিও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। তা ছাড়া দিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এখন শুধু বিয়ের দিনটির জন্য অপেক্ষা।

আমার দিদিকে সবাই সুন্দরী বলতো। দিদির মেমসাহেবের মতন গায়ের রং, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মুখখানা গোল ধরনের। বেশ আদুরে আদুরে ভাব। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় দিদি যথেষ্ট লম্বা। দিদি কোনোদিন আমার বন্ধু হয়নি, বরাবর শত্রুতাই করে এসেছে। আমার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলেই

দিদি নালিশ করতো বাবার কাছে। বাবা বেশী ভালবাসতেন দিদিকে, মা ভালবাসতেন আমাকে। দিদি কোনদিন একটা বকুনি পর্যন্ত খায় নি। বাবার শক্ত হাতের মার অনেকবার আমার পিঠে পড়েছে।

বেঙ্গলি লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান অনিমেষদা দিদির প্রেমে পড়েছিল। লাইব্রেরি বাড়িরই ওপরের ঘরটায় থাকতেন অনিমেষদা। এত বই পড়তে ভালবাসতেন যে আমাদের ধারণা ছিল, লাইব্রেরির সব বই-ই অনিমেষদার মুখস্ত।

এদিকে, ন্যাশানাল বাইক ষ্টোর্সের মালিকের ছেলে ভাস্করদারও খুব টান ছিল দিদির দিকে। ভাস্করদা ডান হাতে পাঞ্জাবীদের মতন একটা বালা পরতেন। পাঞ্জাবীদেরই মতন লম্বা চওড়া চেহারা, সাঁতারে কেউ কোনোদিন ভাস্করদাকে হারাতে পারে নি।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে গেলে মোড়ের মাথায় লাইব্রেরি। আবার বাঁ দিকে গেলে আর এক মোড়ের মাথায় ন্যাশানাল বাইক ষ্টোর্স। দিদি একা বেরিয়ে ডান দিকে গেলেই অনিমেষদা বেরিয়ে আসতেন লাইব্রেরি থেকে। আর বাঁ দিকে গেলে আসতেন ভাস্করদা। দিদির সামনে এসে ও'রা গা মুচড়ে মুচড়ে কথা বলতেন, আমি দেখেছি।

দিদির চেহারায় বেশ একটা রানী রানী ভাব ছিল। অনেকটা যেন অহংকারের সঙ্গে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটতো। অনিমেষদা কিংবা ভাস্করদা, যার সঙ্গেই দেখা হতো, বেশ হেসে হেসে কথা বলতো। যেহেতু দিদি ছিল বাবার আদুরে মেয়ে, তাই যখন তখন সে বাড়ি থেকে বেরুলেও তাকে শাসন করার কেউ ছিল না।

অনিমেষদা কিংবা ভাস্করদা, কার প্রতি যে দিদির পক্ষপাতিত্ব ছিল, তা বোঝা যেত না। দিদি ওদের মধ্যে কারুকে দেখেই বিরক্ত হতো না, বরং দু'জনকে দেখেই খুশী হতো। দু'জনের কাছ থেকেই ছোটোখাটো উপহার নিত, দু'জনের সঙ্গে টুকটাক বেড়াতে যেত। এইভাবে দিদি দু'জনের মনে আশা জাগিয়ে রাখতো।

অজয় একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বল্ তো,তোর দিদির সঙ্গে কার বিয়ে হবে ? অনিমেষদা না ভাস্করদার ?

আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি নি। দু'জনকেই আমার দু'রকম ভাবে ভালো লাগে। অনিমেষদার ছিপছিপে চেহারা, খুব নরম ভাবে কথা বলেন, কোনোদিন আমি অনিমেষদাকে রাগতে দেখিনি। ভারী ভালো লোক। আর ভাস্করদাও দারুণ স্পোর্টসম্যান। জোয়ারের সময় ভাস্করদা ছাড়া আর কে মাঝগঙ্গায় যেতে সাহস করবে ?

অজয় বলেছিল, দেখিস, ভাস্করদাই ঠিক জিতে যাবে! অনিমেষদা কম্পিটিশনে পারবে না।

কথাটা সত্যি মনে হলেও ঠিক মানতে ইচ্ছে করে না। অনিমেষদার জন্য একটু একটু দুঃখ হতো।

সেই বয়েসেই আবছা ভাবে এইটুকু বুঝে গিয়েছিলাম যে অনিমেষদা গরীব, আর ভাস্করদা বিরাট সাইকেলের দোকানের মালিকের ছেলে, বেনারসে ও'দের প'য়তাল্লিশটা রিক্সা, ভাস্করদার গায়ে বেশ জোর-এইসব মানুষেই জেতে। যাদের গায়ের জোর বেশী কিংবা টাকা বেশী, তারাই জিতে যায়। কিন্তু অনিমেষদার মতন মানুষরা এত ভালো হয়েও হেরে যাবে কেন ?

অবশ্য দিদির সঙ্গে এদের দুজনের কারুরই বিয়ে ঠিক হয়নি শেষ পর্যন্ত।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে একদিন বাবার এক বন্ধুর ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। তার নাম দেবাশিস। সাদা সার্ট আর সাদা প্যান্ট পরা, ঠিক ক্রিকেট খেলোয়ারের মতন চেহারা। দারুণ ভালো ছাত্র নাকি। দেবাশিসদা হোস্টেলে থাকেন। আমাদের বাড়িতে সেদিন মাছের ঝোল, ভাত আর পুদিনার চাটনি খেয়ে অভিভুত হয়ে মাকে বললেন, মাসীমা, হোস্টেলের রান্না খেয়ে খেয়ে জিভ পচে গিয়েছিল। আজ যেন ঠিক অমৃত খেলাম।

এর পর থেকে প্রত্যেক রবিবার দেবাশিসদা আমাদের বাড়িতে মাছের ঝোল, পুঁই শাক,লাউ ডাঁটা আর চালতার টক খাবার জন্য আসতে লাগলেন। দিদির সঙ্গেও খুব ভাব হয়ে গেল। বসবার ঘরে দিদি আর দেবাশিসদা একা একা গল্প করলেও মা রাগ করেন না। একদিন দেবাশিসদা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ঠিক ভাস্করদাদের দোকানের পাশের দোকান থেকেই আমাকে একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট কিনে দিলেন। দোকানের দরজার সামনে আড়ষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাস্করদা। আর একদিন শুধু দিদিকে নিয়ে দুর্গাবাড়িতে থিয়েটার দেখতে গেলেন দেবাশিসদা, বেঙ্গলি লাইব্রেরির সামনে দিয়েই। সেদিনও লাইব্রেরি ঘরের জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দিদির দিকে তাকিয়েছিলেন অনিমেষদা।

দুমাসের মধ্যে দেবাশিসদার সঙ্গে দিদির বিয়ে একেবারে ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। আর দুমাস বাদে দেবাশিসদার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার ফাইন্যাল হয়ে গেলেই বিয়ে হবে। এমনও ফিসফাস শুনেছি যে বিয়ের পরেই নাকি দেবাশিসদা দিদিকে বিলেতে নিয়ে যাবেন।

একটু মোটার দিকে ধাত বলে, বিয়ের আগে দিদি যাতে আরও মোটা না হয়ে যায়, সেইজন্য দুপুরে তার ঘুমোনো একদম বারণ। বাবা এখন দিদিকে একা বাইরে বেরুতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। দুপুরের দিকে দিদির সময় কাটে কি করে! দিদি একদম গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে না। দিদি কোনোদিন আমার জামার একটা বোতামও শেলাই করে দেয়নি!

দিদি যেন এই পৃথিবীতে শুধু সুখভোগ করবার জন্যই জন্মেছে। গরীব ঘরের মেয়ে হয়েও দিদি যে একটু সুন্দরী, সেই জন্যই যেন তার অনেক রকম সুযোগ সুবিধে পাওয়ার অধিকার আছে। পুজোর সময় আমি মোটে একটা জামা পেতাম, কিন্তু দিদির জন্য শাড়ি কেনা হতো অন্তত দুটো। তাও বেশ দামী। দিদির

পড়াশুনোয় মন ছিল না তবু বাবা দিদিকে কখনো বকেন নি। শুধু আমাকেই বকতেন। দিদির যে ভালো বিয়ে হবে, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল। বিয়ে হলে আর পড়াশুনোর দরকার কি? আমরা যেন শুধু দিদির সেবা করার জন্যই জন্মেছি।

দুপুরবেলা দিদির একমাত্র কাজ হলো অতনুকে জ্বালাতন করা। দুপুরবেলা আমাদের একতলায় ভালো রোদ আসে না। দোতলায় থাকেন বাড়িওয়ালারা। দিদি ছাদে চলে যায়। তাও ঠিক রোদ্দুরে বসে না, কারণ বেশীক্ষণ রোদে বসলে রং কালো হয়ে যাবে। ছায়াতেই গুটিসুটি হয়ে বসে দিদি শুধু পা দুটো ছড়িয়ে দেয় রোদ্দুরে। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকে, অতনু, এই অতনু, শুনে যা—

অতনু ছাদে উঠে এলে দিদি তাকে বলে, শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ার খুলে দেখবি আমার ব্যাগ আছে। সেটা নিয়ে আয় তো।

অতনু ছুটে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এলে দিদি তাকে জেরা করতে শুরু করে।

—মা'র ঘুম ভাঙিয়ে দিস নি তো?

—না

—তুই আমার ব্যাগ খুলেছিলি?

—না তো।

—ঠিক?

দিদি ব্যাগ খুলে প্রথমে সব পয়সা কোলের ওপর ঢেলে ফেলে খুব মনযোগ দিয়ে গুনতে থাকে দু'একবার সন্দেহাকুল চোখে অতনুর দিকে তাকায়। তারপর খুব আলতোভাবে একটা দশ পয়সা তুলে নিয়ে বলে, যা তো, মোড়ের দোকান থেকে দু'খিলি মিষ্টি পান কিনে নিয়ে আয় তো! ভাজামশলা দিতে বলবি, আর সোঁপ কাকে বলে জানিস? ও তুই বাঙাল—মৌরি, মৌরি, মনে থাকবে তো?

অতনুর সব সময়েই একটা ভীতু ভীতু ভাব। কেউ ওকে জোরে কিছু বললেই যেন কেঁপে ওঠে। কেউ ওকে কোনো কাজ করতে বললে ধন্য হয়ে যায়। দিদির জন্য পান আনতে ছুটে যায় অতনু। ফিরে এসে দিদির হাতে পানটা দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিদি পানটা মুখে দিয়ে বলে, তুই এখন যা—

অতনু নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার দিদি ডেকে ওঠে, অতনু, অতনু!

সে আবার ফিরে আসতেই দিদি চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে, ইঃ, কি পান এনেছিস? মুখ পুড়ে গেল, মুখ পুড়ে গেল—যা, যা, দৌড়ে যা, খয়ের নিয়ে আয়—

এই রকম ভাবে দিদি অতনুকে সারা দুপুর অন্তত দশ বারো বার বাইরে দৌড় করায় নানান ছুতোনাতায়। দিদির এই খেলা আমি বেশ ভালো রকমই জানি। এক সময় আমাকে কম খাটিয়েছে। এখন আর আমি দিদির সব কথা শুনি না। তাই দিদি এখন অতনুর ওপর সব প্রভুত্ব খাটাচ্ছে।

অতনু অবশ্য একটুও আপত্তি করে না। দিদির জন্য হাজার-বার বাইরে ছুটে যেতেও রাজি। ওর যে শুধু মা-বাবা নেই, তাই নয়, ওর তো কোনো দিদিও নেই।

একদিন বিপদে পড়লো অতনু। এই রকম এক দুপুরবেলা দিদি ওকে এলাচ কিনতে পাঠিয়েছিল, সেই সময় ভাস্করদা ওকে ধরলেন।

ভাস্করদা ওর দিকে বাঁ হাতের হাতছানি দিয়ে বললেন, এ লেড়কে, ইধার শুন্, আ ইধার আ—

অত অল্প দিনে অতনু হিন্দী কিছুই শেখেনি। তবু ভাস্করদার ডাক বুঝতে পারে। ভাস্করদা নিশ্চয়ই নজর রেখেছেন যে অতনু আমাদের বাড়িতেই থাকে। অতনুর ন্যাড়ামাথা আর রোগা চেহারা দেখে ভেবেছেন, ও আমাদের বাড়ির চাকর।

—তুই চৌধুরীদের বাড়ি কাজ করিস?

অতনু বুঝতে পারে না। বোকার মতন তাকিয়ে থাকে।

—কথা বলছিস না কেন? হাঁ করে কি দেখছিস?

খেলার ছলে ভাস্করদা অতনুর ডান হাতটা ধরে মুচড়ে দ্যান। অতনু কাঁদে না, চেঁচিয়ে ওঠে না, শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

ভাস্করদা কোনদিন আমার হাত মুচড়ে ধরার সাহস করতেন না এই ভাবে। বরং আমাকে দেখলে সব সময়েই আদর করে কথা বলতেন। অতনুকে তিনি ভেবেছেন কিনা এলেবেলে। পরে অতনুর মুখে এ ঘটনা শুনে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। ভাস্করদার দোকানের মধ্যে ঢুকে বলেছিলাম, আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন কেন? ভাস্করদা মনেই করতে পারেন নি ঘটনাটা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, সে কিরে পাগলা তোর ভাইকে আমি মারবো কেন? তা কখনো হয়।

যাই হোক, সেদিন ভাস্করদা অতনুর হাত মুচড়ে ধরে অনেক জেরা করেছিলেন। যখন বুঝেছিলেন যে অতনু চাকর নয়, তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, সুভদ্রা তোর কে হয়?

—আমার দিদি।

—কি রকম দিদি? সুভদ্রার মা তোর কে?

—আমার মাসীমা

ভাস্করদা একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, এলাচ কিনছিস কার জন্য, সুভদ্রার জন্য?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে তোকে পয়সা দিতে হবে না।

ভাস্করদাকে পাড়ার সব দোকানদারই চেনে। সবাই মনে মনে একটুখানি সমীহ করে। ভাস্করদা দশকর্ম ভাণ্ডারের ঝুড়ি থেকে এক মুঠো এলাচ তুলে ওকে বললেন, যা নিয়ে যা। আর শোন একটা কাজ করবি।

অতনুকে দোকান থেকে একটু দূরে সরিয়ে এনে ভাস্করদা

বললেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সুভদ্রাকে বলবি, এক্ষুনি এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। খুব জরুরি একটা কথা আছে। বলবি, ভাস্করদা ডাকছে। কি বলবি ?

অতনুকে দিয়ে কথাটা একবার পাখি পড়ানোর মতন বলিয়ে নিয়ে তারপর ভাস্করদা তাকে আবার একটা ধমক দিয়ে বললেন, বেশী যেন দেরি না হয়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

অতনু গিয়ে অবিকল সেই কথা দিদিকে বললো।

আর শোনা মাত্রই দিদি যেন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। অতনুর কান ধরে ঠাস্ করে এক চড় মেরে দিদি বললো, কি বললি ? তুই কি বললি আমাকে ! অসভ্য ছেলে !

সেই এক চড় মেরেও দিদির শান্তি হলো না। কান ধরে আরও গর্জাতে লাগলো। এলাচগুলো সব ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। শব্দ পেয়ে মা জেগে উঠলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ?

দিদি অনায়াসে বললো, দ্যাখো না মা, এ কদিনের মধ্যেই রাস্তার বখাটেদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে।

মা অবাক হয়ে বললেন, সে কি ? ও রাস্তাঘাট চেনেই না। ও আবার এখানে কার সঙ্গে মিশেছে ?

—দ্যাখো না, কে নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে নাকি তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কি সাহস ? কি আস্পর্ধা !

ছোটদের কষ্ট দিয়ে দিদির যে কেন এত আনন্দ, তা আমি কখনো বুঝতে পারিনি। মাত্র দু'মাস আগেও দিদি ভাস্করদার সঙ্গে নৌকায় চেপে বেড়াতে গিয়েছিল। আমরা তো জানতাম, দিদি অনিমেষদার বদলে ভাস্করদাকেই বিয়ে করবে। এখন যদি দিদি ভাস্করদার ওপর রেগে গিয়ে থাকে, তাতে অতনুর কি দোষ ? দিদি নিজে গিয়ে ভাস্করদাকে বুকে দিয়ে আসতে পারতো না ?

প্রথম প্রথম আমিও অতনুকে পছন্দ করিনি। আমার মনে হতো, আমাদের বাড়িতে এসেও আমার মায়ের কাছে আমার আদরে

ভাগ বসিয়েছে। আমাকে ভোর বেলা উঠতে হয়, ও বেলা করে ঘুমোয়। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন দেখলাম, অতনু দুর্বল আর অসহায় বলে সবাই ওর ওপর অত্যাচার করে, সবাই ওকে খাটায়, ওর দলে কেউ নেই, তখন আমিই অতনুকে ভালবেসে ফেললাম। আমি ওর দলে হয়ে গেলাম।

অতনুকে আমি মাঝে মাঝে একা একা কিংবা ঘুমের মধ্যে কাঁদতে শুনেছি। কিন্তু মার খেয়ে বা বেশী খাটুনি খেটে ও কখনো কাঁদে নি। শুধু একদিন আবার খুব বেশী কাঁদলো।

নতুন বছরে আমরা নতুন ক্লাসে উঠলাম। আমার আর অজয়ের ক্লাস টেন। প্রায় বড়দের দলে এসে গেছি আমরা। অতনু আমাদেরই সমবয়সী, ক্লাস টেনেই ওর পড়বার কথা,কিন্তু ইস্কুলে ওকে কিছুতেই ক্লাস টেনে ভর্তি করলো না। অতনু ক্লাস নাইনের পরীক্ষা দিয়ে আসে নি, এখানেও পরীক্ষা দিতে দেয়নি, সেই জন্য ওকে ক্লাস নাইনেই আবার ভর্তি হতে হলো। অতনু কিছুতেই রাজি হয়নি। আমার বাবার পা ধরে কেঁদেছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—বাবারও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের দারুণ কড়া হেড স্যারকে রাজি করানো গেল না কিছুতেই।

এক ক্লাস নীচে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে অতনু আমাদের থেকে ছোট হয়ে গেল। আমরা হলাম ওর দাদার মতন। অজয় তো দাবিই করে বসলো, এর পর থেকে অতনু তাকে অজয়দা বলে ডাকবে। যদিও মুন্নি তখন পড়ে ক্লাস এইটে, কিন্তু সে কিছুতেই আমাদের দাদা বলবে না।

মাস ছয়েকের মধ্যেই অতনু তার অপমানের প্রতিশোধ নিল। যখন তার মাথায় আবার পরিপূর্ণ চুল গজালো আর রোগা হাত পা গুলোতে একটু মাংস লাগলো, তখন দেখা গেল আমাদের মধ্যে অতনুকেই সব চেয়ে বেশী সুন্দর দেখতে। যেন সে এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র, ইচ্ছে করেই এতদিন অন্য রকম হয়েছিল।

অবশ্য, সেই বয়েসে, ছেলেদের মধ্যে কার চেহারা কত ভালো, তা নিয়ে আমরা একটুও মাথা ঘামাইনি। আমরা সেসব কিছু লক্ষ্যই করতাম না। অন্য লোকেরাই অতনুকে দেখলে বলতো, বাঃ ছেলেটিকে খুব সুন্দর দেখতে তো! একথা কেউ কোনদিন আমাকে দেখে বলে নি। আমি অন্য আর পাঁচজন ছেলের মতনই একটা ছেলে। যাই হোক, অতনু সম্পর্কে অন্যদের এ কথা শুনেও আমার হিংসে হতো না। ও তো আমাদেরই দলের।

বছরের শেষে পরীক্ষায় ওর ক্লাসের মধ্যে অতনু ফার্স্ট হলো। সেদিন আমি অতনুকে অজয়ের বাড়ি নিয়ে গিয়ে সগর্বে সেই কথাটা বলতে লাগলাম সকলকে। অতনু তো আর নিজের মুখে বলবে না। অজয়ের মা, দাদা-বৌদি, ছোট বোন—সবাই খুব খুশী হলেন শুনে। মুন্নিও বসে ছিল সেখানে। শুধু সেই বললো উল্টো কথা। মুন্নি ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, এক ক্লাসে দু'বার পড়লে সবাই ফার্স্ট হতে পারে! এ আর এমন কি!

একথা শুনে সবাই বকলো মুন্নিকে। আমার ইচ্ছে হলো ওর পিঠে কিল মারি। কিন্তু অতনু হেসে ফেললো।

ফার্স্ট হওয়ার ফলে অতনুর আর একটা দারুণ লাভ হলো। ও পেয়ে গেল হরিরাম গোয়েঙ্কা স্কলারশীপ। আমাদের স্কুলে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসে যে-ই ফার্স্ট হবে, সেই পাবে সারা বছর ধরে কুড়ি টাকা প্রতি মাসে। অতনুর জীবনে সেই প্রথম রোজগার। আমরা তখনো নিজস্ব কোন টাকার কথা ভাবতেও পারি না। অতনুই জিতে গেল আমাদের মধ্যে।

অতনুর টাকা কি ভাবে খরচ করা হবে, তা নিয়ে অজয় আর আমি মিটিংএ বসে গেলাম। ওটা যেন আমাদের তিনজনেরই টাকা। অতনুর আলাদা কিছু বক্তব্য থাকতেই পারে না।

প্রথম মাসের টাকাটা বেশ একটা ভালো ভাবে খরচ করতে হবে। পরের মাসের কিছু কিছু টাকা দিয়ে না-হয় বই টই কেনা

যাবে, কিন্তু প্রথম মাসে ও সব কিছু না। একটা দারুণ কিছু করা দরকার। যদিও অজয় আর আমার সেবারই টেস্ট পরীক্ষা, তবু অনেকটা সময় আমাদের কেটে যায় পরিকল্পনায়। পিকনিক, নৌকায় বেড়ানো, সিনেমা—কোনোটাই ঠিক মনঃপূত হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, আমরা বাড়ির কারুকে কিছু না বলে চুনার ঘুরে আসবো একদিন। চুনারের কেল্লা আমাদের দেখা হয়নি। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে নয়, শুধু আমরা নিজেরা দেখবো। প্রথমে অমরা বাসে করে চলে যাবো মোগলসরাই, খুব ভোরবেলা। তারপর সেখান থেকে এক্কা ভাড়া করবো। দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভেবে আগে থেকেই আমাদের রোমাঞ্চ হয়।

কথা ছিল, আমাদের তিনজনের বাইরে আমাদের পরিকল্পনা আর কাক পক্ষীতেও জানবে না। বাবা-মায়েরা জানতে পারলে তো যেতেই দেবে না আমাদের। ফিরে এসে বকুনি খেতে হবে ঠিকই। কিন্তু সে তখন দেখাযাবে। তবু আমাদের গোপন অভিযানের কথা তিনজনের বাইরে কে যে ফাঁস করে দিয়েছিল আজও জানি না। সকালবেলায় বাসে মোগলসরাই পৌঁছে দেখি, সেখানে মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে আগে থেকে। সেই ছেলেদের মতন প্যান্ট সার্ট পরা।

মাথা দোলাতে দোলাতে মুন্নি বললো, কি, ভেবেছিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে? আমি ছাড়ছি না। আমি ঠিক এসেছি।

আমরা আঁতকে উঠলাম। মুন্নি আমাদের সঙ্গে যাবে! এ কথা আমাদের বাড়ির লোক আর মুন্নির বাড়ির লোক জানতে পারলে আমাদের পিঠের চামড়া আর আস্তো থাকবে না।

॥ ৩ ॥

মুন্নিকে দেখে আমরা একই সঙ্গে রাগ, বিরক্তি এবং ভয় অনুভব করলুম। মুন্নি আমাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিতে এসেছে। কী করে ও আমাদের এই গোপন পরিকল্পনা টের পেয়ে গেল?

কেউ মনোনীত না করলেও অজয়ই আমাদের দলপতি। আমাদের কারুকে কিছু বলতে না দিয়ে সে এগিয়ে গেল। মুন্নির সামনে দাঁড়িয়ে দু'কোমরে হাত দিয়ে সে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুই এখানে কী করছিস?

মুন্নি অজয়কে ভয় পায় না। সে দুষ্টুমি ভরা গলায় বললো, বেড়াতে যাচ্ছি।

অজয় নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবার ধমকে বললো, বেড়াতে যাচ্ছিস মানে? কার সঙ্গে যাচ্ছিস?

—কার সঙ্গে আবার। একলা।

—একলা? এত সকাল বেলা তুই একলা একলা বেড়াতে এসেছিস? বাড়িতে বলে এসেছিস?

—তাতে তোর দরকার কি?

অজয়ের চোখ মুখ রাগের চোটে লালচে হয়ে গেছে। অন্য জায়গা হলে সে এতক্ষণে মুন্নিকে একটা থাপ্পড়ই কষিয়ে দিত। নেহাৎ বাস ডিপোতে অনেক লোকজন।

ততক্ষণে আমরা অজয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। মুন্নিটা যেমন একরোখা, অজয়ের রাগী রাগী কথায় সে যে কোনো উত্তরই দেবে না, তা আমি বুঝে গেছি। মুন্নিটা তবু আমার সঙ্গে একটু শান্তভাবে কথা বলে। আমাকে মানে।

তাই আমি অজয়কে সরিয়ে ওকে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস

করলাম, তুই এদিকে কোথায় যাবি রে মুন্নি? মোগলসরাইতে কী দেখবার আছে?

আমাদের আবার স্তম্ভিত করে মুন্নি উত্তর দিল, আমি চুনার যাচ্ছি। এই তো সামনেই বাস।

তা হলে মুন্নি সবই জানে। আমাদের গোপন কথা কেউ মুন্নির কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। কে সেই বিশ্বাসঘাতক? আমি যে বলিনি, তা তো আমি জানিই। অজয় যে-রকম রেগে গেছে, তাতে সে কখনো মুন্নির এখানে আসার জন্য দায়ী হতে পারে না। তবে কি অতনু? কিন্তু অতনুর সঙ্গে মুন্নির দেখা হলো কখন? অথচ অতনু ছাড়া আর কেই বা বলবে? যদিও এর একটু পরেই মুন্নি এমন একটা কথা বলেছিল যে তাতে মনে হয়েছিল, অতনুর সঙ্গে ওর কোনদিন বন্ধুত্ব হতেই পারে না।

মুন্নি আজ আবার প্যান্ট সার্ট পরে এসেছে। ওর এ রকম পোষাক পরা ওর বাড়ির কেউই পছন্দ করেন না। মুন্নির মা'র অনেকদিন ধরে অসুখ, উনি বিছানাতেই শুয়ে থাকেন। কিন্তু মুন্নির দাদা বাবা অনেক সময়ই মুন্নির দুরন্তপনা বা জেদের জন্য খুব বকাবকি করতেন। কিছুদিন হলো ওদের বকুনিতেই মুন্নি প্যান্ট সার্ট বাদ দিয়ে শাড়ি পরা শুরু করেছিল। আজ আবার সেই পোষাক পরেছে। তার মানে, বাড়ির কারুকে না জানিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমাদেরই মতন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে মুন্নির অনেক তফাৎ।

অজয় গম্ভীরভাবে বললো, মুন্নি, তোকে উল্টো দিকের বাসে তুলে দিচ্ছি, তুই এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যা।

মুন্নি বললো, ইঃ! আবদার আর কি! কেন আমি ফিরে যাবো।

—তোকে ফিরে যেতেই হবে।

—আহা! আমি কি তোদের সঙ্গে এসেছি যে তোরা আমাকে ফিরে যেতে বলছিস? আমার যেখানে খুশী আমি যাবো।

—কেন পাগলামি করছিস, মুন্নি? তোর জন্য আমাদের সবাইকে বকুনি খেতে হবে! আমরা তোকে নিতে চাই না, তবু তুই কেন যাবি।

—বেশ করবো!

—এতো মহা মুস্কিল দেখছি। শেষকালে কি তোকে চ্যাংদোলা করে বাসে তুলতে হবে?

মুন্নি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললো, চেষ্টা করে দ্যাখ না!

আমি তো জানি, জোর করতে গেলেই মুন্নি হয় হাতে কামড়ে দেবে, নয় চ্যাঁচাবে! গায়ের জোরে হেরে গেলেই মুন্নি এই দুটো অস্ত্র ব্যবহার করে। এরপরেও তো ওর শেষ অস্ত্র আছেই। কান্না!

মুন্নির দাদা বাদলদা আমাদের দেখলেই বকেন। বড্ড রাগী বাদলদা। পাড়ার কারুর সঙ্গে ভাব নেই। মুন্নি যে আমাদের সঙ্গে মেশে, এটা তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না। কিন্তু আমরা যে সেধে সেধে মুন্নিকে কখনো ডাকতে যাই না, সেটা বাদলদা কিছুতেই বুঝবেন না। এই জন্যই তো মুন্নিকে আমরা কোনো খেলাতেই নিতে চাই না!

অতনু বললো, চুনারের বাস কিন্তু এক্ষুনি ছাড়বে!

আমি বললাম, এখন দুটো উপায় আছে। হয় আমরাও এখান থেকেই ফিরে যাই, অথবা মুন্নিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

অজয় হতাশভাবে বললো, অন্য কেউ হলে তো নিয়েই যেতাম। কিন্তু ও যে মেয়ে!

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচি কেটে বললো, মেয়ে! মেয়ে তো কি হয়েছে? যদি অতনু যেতে পারে, তা হলে আমি পারি না? ওতো মেয়েদেরই মতন।

অতনুর ফর্সা মুখটা আপমানে লাল হয়ে গেল। আমাদের সেই বয়েসটাতে কোনো ছেলেকে মেয়ে বলাটাই ছিল সবচেয়ে অপমানের

মুন্নিটা বড্ড নিষ্ঠুর, সুযোগ পেলেই অতনুকে এ রকম খোঁচা মারে।

রাগ করলে অতনু সামান্য একটু তোত্‌লা হয়ে যায়। সেই থেকেই বুঝলাম, ওর খুব রাগ হয়েছে।

অতনু বললো, তা-তা হলে আমি যাবো না, তোমরা ওকেই নিয়ে যাও।

এটা একটা অসম্ভব কথা। অতনুর স্কলারশীপের টাকাতে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। টাকাটা যদিও অজয়ের পকেটে এখন, তবু অতনুকে বাদ দিয়ে শুধু আমরা কি যেতে পারি?

কিন্তু আর কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার আগেই চুনারের বাস গোঁ গোঁ করে ছেড়ে দিল। আমরা টপটপ করে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। মুন্নিও।

আমরা বসলাম বাসের একেবারে পেছনের সীটে। ঝাঁকুনিতে এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশী লাফায় বলেই আমার এই সীটটা সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে। মুন্নি বসেছে একটুখানি এগিয়ে। আমরা ওর সঙ্গে আর কোনো কথা বললাম না। একটু বাদে যখন কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলো, অজয় তিনখানা টিকিট কাটলো মাত্র। আমরা আড়চোখে মুন্নির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুন্নিও আমাদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টাও করলো না। পকেট থেকে অনেকগুলো খুচরো পয়সা বার করে টিকিটের দাম গুনে দিল।

এমন কি, একটু বাদে এক জায়গায় বাস থামবার পর, একজন খরমুজা ওয়ালার কাছ থেকে আমরা তিনটে খরমুজাই কিনলাম। মুন্নিও নিজের জন্য একটা কিনলো। পৃথিবী শুদ্ধু লোক জানুক মুন্নি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। সে আমাদের কেউ নয়।

চুনারে এসে পোঁছোবার পরই আমরা তিনজন টপাটপ নেমে পড়লাম বাস থেকে। খুব চটপট একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ফেললাম। সেটাতে উঠে বসার পর সেটা যখন চলতে শুরু করেছে খানিক দূর

এগিয়েছে, তখন দেখলাম, মুন্নি বাস থেকে নেমে একা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে।

কপালের ওপর এসে পড়েছে চুল, হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা, মুন্নি এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আমাদের টাঙ্গাটার দিকে। সেই দৃষ্টিতে রাগ কিংবা অভিমান ছিল জানি না, তবু আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ মুচড়ে উঠলো। এ রকম একটা অচেনা জায়গায় কি মুন্নিকে আমরা একা ফেলে যেতে পারি? মুন্নি তো আমাদেরই মুন্নি।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, রোক্‌কে।

অজয় কিংবা অতনু একটুও আপত্তি করলো না। বোধহয় ওরাও মনে মনে একই কথা ভাবছিল।

অজয় তড়াক্ করে টাঙ্গা থেকে নেমে দৌড়ে গেল। তারপর মুন্নির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো। মুন্নি আসতে চাইছে না, ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে কেন?

টাঙ্গার কাছে এসেও মুন্নি কিছুতেই ওপরে উঠবে না। অজয় ওর দু'হাত শক্ত করে ধরে রইলো। আমি ওর কোমর ধরে টাঙ্গার ওপর তুলে নিলাম। তারপর, যেন আমরাই অপরাধ করে ফেলেছি এইভাবে মুন্নিকে কাকুতি-মিনতি করে বললাম রাগ করিস না ভাই। তোর সঙ্গে মজা করছিলাম, তোকে কি সত্যি আমরা ফেলে যেতে পারি?

অজয় আমাদের বললো, যা বকুনি খাবার আমিই খাবো। আমি ফিরে গিয়ে বলবো, মুন্নিকে আমিই জোর করে নিয়ে এসেছি। তোদের কোনো দোষ নেই!

আমি বললাম, ফেরার সময় মুন্নি একটু আগে আলাদা ফিরবে। তা হলেই কেউ বুঝতে পারবে না।

অজয় তবু বললো, বুঝুক, না বুঝুক, সে আমার দায়িত্ব।

চুনারে এমনি আর কি দেখবো, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুর্গটা দেখার। পুরোনো দুর্গের কথা শুনলেই বুকের মধ্যে কী রকম যেন গুড়ু গুড়ু শব্দ হয়। কত যুদ্ধ হয়েছে এখানে। সেইসব কামানের গর্জন আর তলোয়ারের ঝন্‌ঝনা যেন এখনো কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে।

চুনার দুর্গটা একটা পাহাড়ের ওপরে। আসলে পাহাড় কেটে কেটেই দুর্গটা বানানো।

টাঙ্গাওয়ালা দুর্গের একেবারে ওপরে ওঠার কথা শুনে গাঁই গুঁই করতে লাগলো। যদিও বা ওঠে, তা হলে সে সাত টাকা নেবে ওকেই সাত টাকা দিয়ে দিলে আমাদের আর থাকবে কি? পাহাড়ের কাছে এসে আমরা টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম। হেঁটেই উঠবো।

ঘোরানো ঘোরানো রাস্তা। মুন্নি প্রথমেই দৌড়াতে শুরু করেছিল, অজয় তাকে এক ধমক দিল। পাহাড়ী রাস্তায় কেউ দৌড়ালে একটু বাদেই হাঁপিয়ে যায়। পাহাড়ে উঠতে হয় আস্তে আস্তে।

খানিকটা উঠে অজয় জিজ্ঞেস করলো, এই দুর্গটা কে বানিয়েছিল, জানিস?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আকবর।

অতনু বললো, না।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, না মানে? তবে কে বানিয়েছে?

অতনু বললো, এটা তারও অনেকদিন আগেকার। এটা বানিয়েছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের এক ভাই তাঁর নাম ভর্তিনাথ।

আমি আর অজয় হেসে উঠলাম। বিক্রমাদিত্যের আবার ভাই কোথা থেকে এলো? কোনোদিন শুনিনি তো!

অতনু বললো, আমি একটা গল্পের বইতে পড়েছি।

অতনু আমাদের চেয়ে গল্পের বই বেশী পড়ে ঠিকই, তবু আমার কেমন যেন হলো, সে গুল্ মারছে। আমি বললাম, ভ্যাট, বাজে কথা।

অতনু বললো, মোটেই বাজে কথা নয়। আমি ফিরে গিয়ে তোদের বইটা দেখাতে পারি। বইতে কখনো বাজে কথা লেখে না।

সেটা অবশ্য আমরা অস্বীকার করতে পারলাম না। সেই বয়সে আমাদের মনে হতো, ছাপার অক্ষর মাত্রই সব সত্যি।

অতনু বললো, আমার বাবা বলতেন, কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবার আগে সেই জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু পড়ে নিতে হয়। বাবার সঙ্গে আমি একবার মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, তার আগে বাবা আমাকে মুর্শিদাবাদের সব ইতিহাস বলে দিয়েছেলেন।

অনেকদিন বাদে অতনুর মুখে তার বাবার কথা শুনলাম। অতনু ওর বাবা-মা'র কথা প্রায় উচ্চারণই করতে চায় না। আমাদের বাবা-মা আছে, অতনুর নেই—এই একটা ব্যাপারে আমরা অতনুর কাছে যেন হেরে যাই।

অতনু বললো, এই জায়গাটার নাম আগে ছিল চরণাদ্রি। সেই থেকে চুনার হয়েছে। দুর্গটা অনেকদিনের পুরোনো, অনেক রাজা বাদশা অবশ্য এটাকে বারবার নতুন করে তৈরি করেছেন। এক সময় এই দুর্গটা ছিল শের শাহর। তারপর আকবর এটা কেড়ে নেন। মোগল রাজত্বের শেষ দিকে এটা চলে যায় অযোধ্যার নবাবদের দখলে। এখন এটা ইংরেজদের।

অতনুর গম্ভীর গলা শুনে আমরা এবার তার কথাই সত্যি বলে মেনে নিয়েছিলাম। শুধু মন্নি হাসতে হাসতে বললো কি বললি, এখন এটা ইংরেজদের ?

অতনু বললো নিশ্চয়ই। ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধে এই দুর্গটা ইংরেজরা নিয়ে নিয়েছে।

মুন্নি তবু হি-হি করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, তুই পুরোনো ইতিহাস বই পড়েছিস। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন না ? এখন আবার ইংরেজদের কোনো দুর্গ আছে নাকি এদেশে ? এখন তো সবই আমাদের।

মুন্নিতো ঠিকই ধরেছে। অতনু বইয়ের পাতা মুখস্ত বলছিল, এটা খেয়াল করেনি।

মুন্নি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখলি তো, পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেই ছেলেরা কি রকম বোকা হয়ে যায়!

লজ্জায় অতনুর মুখটা লাল হয়ে গেল।

দুর্গের একদিকটা ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে রেখেছে, সেদিকে যেতে দেয় না। আর একদিকে, যেখানে মন্দির আছে, সেখানে যাওয়া যায়। আমরা যখন ওপরে এসে পৌঁছোলাম তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছিলাম। বুকের মধ্যে যেন একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। মন্দিরের সামনে একটা জলের কল থেকে আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মেটালাম।

মন্দিরের ডান পাশ দিয়ে খানিকটা গেলেই দুটো বিরাট বিরাট ঘর। এক সময় বোধহয় এই ঘরেই রাজা-বাদশারা থাকতেন। এমন চমৎকার জায়গায় কি আর কেউ থাকতে পারে।

ঘর দুটির সামনে খানিকটা চত্বর। সেই চত্বরটা পেরিয়ে নীচু পাঁচিলের সামনে দাঁড়ালে হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কী অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। এখান থেকে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে, ঠিক নীচেই গঙ্গা। রোদ্দুরে গঙ্গার জল এখন সম্পূর্ণ রুপোলি। এখানে গঙ্গানদী বাঁক নিয়েছে। ঠিক যেন একটা চন্দ্রহার।

গঙ্গার বুকে ভাসছে পাল তোলা কয়েকটা নৌকা। একটা স্টিমার যাচ্ছে জল কেটে কেটে, ওপর থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা খেলনা! ওপর থেকে কোনো শব্দও পাওয়া যায় না। কী শান্ত, নিস্তব্ধ জায়গাটা।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউ একটাও কথা বললাম না। আমাদের বেশী আনন্দ হচ্ছে এই জন্য যে, এমন সুন্দর একটা জায়গা আমরা নিজেরাই আবিষ্কার করেছি, কোনো গুরুজন আমাদের এ জায়গাটা দেখাতে নিয়ে আসেন নি। আমাদের জীবনে এটাই প্রথম।

একটু বাদে মুন্নি বললে, তোরা কি স্বার্থপর রে! এমন একটা চমৎকার জায়গায় তোরা আমাকে না নিয়েই চলে আসছিলি!

আমাদের মধ্যে অজয় সবচেয়ে রাগী। ভেবেছিলাম সে মুন্নিকে আবার একটা ধমক দেবে। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে অজয় নরম গলায় বললো ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি মুন্নি, এবার থেকে আমরা যেখানেই যাবো, তোকে ঠিক নিয়ে যাবো। তুই যখন এত বেড়াতে ভালোবাসিস, তোকে নেবো না কেন ?

মুন্নি বললো, আমরা এই জায়গাটায় অনেকক্ষণ থাকবো। এদিক দিয়ে নীচে নামা যায় না ? গঙ্গার ধার পর্যন্ত ?

এদিকে কোনো রাস্তা নেই। খাড়া পাহাড়। তবু পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নামা যায় হয়তো। খানিকটা চেষ্টা করে দেখলে হয় অন্তত। কিন্তু আসলে তখন আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। মোগলসরাই স্টেশনে আমরা কিছু খেয়ে নেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু মুন্নির সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে তা আর হয় নি। পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমের পর এখন পেটে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কেউ আগে মুখ ফুটে কিছু বলছে না !

আমাদের সামনে গঙ্গা, বাঁ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত পাহাড়ের সারি। অতনু সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ পাহাড়ের নাম জানিস ? ঐ হচ্ছে বিন্ধ্য পর্বত !

বইতে পড়া কোনো জিনিষ হঠাৎ চোখের সামনে দেখলে কী রকম রোমাঞ্চ হয়। এই সেই বিন্ধ্য পর্বত ? যে পর্বত হিমালয়ের চেয়েও উঁচু হতে পারতো ! নেহাৎ অগস্ত্য মুনিকে দেখে নমস্কার করবার জন্য মাথা নীচু করেছিল, আর তুলতে পারেনি, তাই !

আমরা কাশীতে থেকেও বিন্ধ্য পর্বত চিনতে পারিনি, আর অতনু বর্ধমান থেকে এসে চিনে ফেললো, এতে ওকে আমার আবার একটু হিংসে হলো।

অজয় হঠাৎ বললো, মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছিস ?

সত্যি একটা গন্ধ আসছিল। বোধহয় মুর্গীর মাংস। সেই গন্ধে আমাদের খিদে আরও বেড়ে যায়।

বড় বড় ঘর দু'খানার পেছন দিকে খানিকটা নেমে গেলে কয়েকটা

ছোট ছোট খুপরি। গন্ধ অনুসরণ করে আমরা সেইখানে এসে পৌঁছোলাম। একজন চৌকিদার শ্রেণীর লোক বাইরে উনুন এনে রান্না চাপিয়েছে।

অজয় জিজ্ঞেস করলো, হিঁয়া খানা মিলতা হ্যায় ?

লোকটি বললো, নেহি। ইয়ে এস. ডি. ও. সাহাবকা খানা বনতা হ্যায়।

তা হলে আমরা কোথায় খাবো ?

লোকটি বললে, পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলে বাজারের কাছে হোটেল আছে।

ওরে বাবা, এখন পাহাড় থেকে নীচে নেমে তারপর খেতে গেলে ততক্ষণে যে আমাদের নাড়ি ভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে।

অজয় লোকটিকে কাকুতি মিনতি করে বললো, ভাইসাব, আপনার এখানেই আমাদের একটু খানা বানিয়ে দেন না। আমরা পয়সা দেবো।

লোকটি সহজে রাজি হতে চায় না। অজয় তখন মোক্ষম চালটি দিয়ে বললো, আমরা ব্রহ্মণ, আমাদের খিদে পেয়েছে, আপনি আমাদের খাওয়াবেন না ? আপনার দয়া হবে না ?

ব্রাহ্মণ শুনলে এখনো এদিককার লোক খাতির করে। তাতেই কাজ হলো। লোকটি বললো, মুর্গীর মাংস সে দু'বেলার জন্য রান্না করেছে, তা থেকে আমাদের একটু একটু দিতে পারে। তবে ভাত নতুন করে চাপাতে হবে। এক টাকা আট আনা করে প্লেট পড়বে।

তাতেই যেন আমরা হাতে স্বর্গ পেলাম। ভাগ্যিস টাঙ্গা-ওয়ালাকে আমরা সাত টাকা দিইনি।

লোকটি আবার ভাত চাপালো। আমরা হ্যাংলার মতন কাছেই দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের চার জোড়া চোখ খিদেতে চকচক করছে।

আমার মনের মধ্যে অবশ্য একটা কাঁটা বিঁধছিল। মুর্গীর মাংস

আমি কি করে খাবো? আমরা কাশ্মীর ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে কোনোদিন মুর্গী ঢোকে না। কোনোদিন কোনো দোকানেও আমি মুর্গীর মাংস খাইনি। আজ এত বড় বে-আইনি কাজটা করবো? বেশ ভয় ভয় লাগে। বহু দিনের পারিবারিক সংস্কার কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা। মুর্গীর মাংস খেতে কী রকম তাও জানি না, যদি প্রথমবার খেতে গিয়ে হঠাৎ বমি আসে?

কিন্তু অন্যরা কেউ কিছু বললো না দেখে আমিও মুখ খুললাম না। যদি আমাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করে। অতনু বোধহয় আগে মুর্গী খেয়েছে। শুনেছি বাংলাদেশের বাঙালীরা সব খায়। কিন্তু অজয়? মুনি? দেখাই যাক না কি হয়।

উঃ, ভাত সেদ্ধ হতে এত সময় লাগে? ফুটছে তো ফুটছেই। চৌকিদার লোকটি নির্বিকার। সে এক মনে বসে পেঁয়াজ কুটছে আর চোখের জল ফেলছে। বাষ্পের ধাক্কায় হাঁড়ির ঢাকনাটা ঢক ঢক করে লাফাচ্ছে বারবার। আমার বলার ইচ্ছে হলো, ও চৌকিদার, এবার দেখুন না, সেদ্ধ হয়ে গেছে বোধহয়।

এই সময় জুতো মশ্ মশিয়ে একজন বিশাল, দীর্ঘকায় লোক এলেন উল্টো দিক থেকে। সুট পরা, গালে ঘন দাড়ি, মুখে পাইপ। তাঁকে দেখে চৌকিদার যেমন সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, তাতেই বুঝলাম, ইনিই বোধহয় এস. ডি. ও. সাহেব।

তিনি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যেয়া, খানা বন গায়া?

সেখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা অপরাধ কিনা বুঝতে না পেরে আমরা একটু জড়োসড়ো হয়ে গেলাম।

চেহারা দেখে মনে হয় পশ্চিমী মুসলমান। বেশ রাশভারী লোক। হঠাৎ দাবড়ে দিলে আমরা কী করবো জানি না।

কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে তিনি হঠাৎ ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বাংলাতেই আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি বেড়াতে আসা হয়েছে?

আমরা বিগলিত হয়ে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমরা বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—বেনারস থেকে।

—বাঃ ভেরি গুড। কলেজ স্টুডেণ্ট?

অজয় বোধহয় হ্যাঁ বলে দিতেই যাচ্ছিল, এইসব জায়গায় একটু মিথ্যে কথা বললে কে-ইবা ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু অতনু তার আগেই বলে দিল, না, আমরা স্কুলে পড়ি।

অজয় তবু যোগ করলো, এবারেই ফাইন্যাল দেবো।

ভদ্রলোক আবার বললেন, গুড! বাঙালীরা খুব বেড়াতে ভালোবাসে। তাই না? ইভ্‌ন দা স্কুল বয়েজ গো ফর সাইট সিয়িং! গুড্!

মুনি ওঁর সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে এস. ডি. ও. সাহেব মুনির কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার নাম কি খোকা?

॥ ৪ ॥

এস. ডি. ও. সাহেব মুন্নিকে ছেলে ভেবেছেন বলে আমাদের একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম। কিন্তু মুন্নি চটে গেল। সে এক ঝাপটা মেরে সরে গেল ভদ্রলোকের কাছ থেকে। অজয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

উনি অজয়কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি দু'ভাই?

আমরা বুঝতে পারলাম না, ভদ্রলোকের ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত কিনা। আমাব খুব ক্ষীণ ভাবে মনে হতে লাগলো, আমাদের মতন তিনজন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের বেড়াতে আসা—সঙ্গে কোনো গুরুজন নেই, এটা বোধহয় অন্য লোকেরা পছন্দ করবে না। মুন্নির পোষাক দেখে এস. ডি. ও. সাহেব যখন ভুল করেছেনই তখন ভুলটা রেখে দেওয়াই ভালো।

আমি বললাম, আমরা সবাই বন্ধু। কেউ কারুর ভাই নয়।

উনি বললেন, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

অজয় বললো, আমরা তো চারজন।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর বললেন, বইটা তোমরা পড়োনি বুঝি। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আসলে চার বন্ধুর গল্প।

অতনু মৃদু গলায় বললো, আমি পড়েছি।

—পড়েছো? বলো তো তিনজন মাস্কেটিয়ার ছাড়া অন্য বন্ধুর নাম কি?

—দার্তাগ্নান!

—বাঃ! ভেরি গুড! ব্রাইট বয়! তোমরা বাইরে বসে খাবে কেন? আমার কামরায় এসো—সেখানেই তোমাদের সার্ভ করবে।

এস. ডি. ও. সাহেবের ভদ্রতায় আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে

গেলাম। আমরা তক্ষুনি রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মুন্নি আপত্তি করলো। ও বললো, না, আমরা এখানেই বসে খাবো।

—কেন?

—রোজই তো ঘরের মধ্যে খাই. কোনোদিন তো এ রকম বাইরে খাই না।

—ঠিক আছে, এনজয় ইয়োরসেলফ!

উনি গট্ মট্ করে চলে গেলেন ঘরের দিকে।

রান্না যদিও হয়ে গেছে, কিন্তু চৌকিদার তক্ষুনি দিল না আমাদের। তার সাহেব এসে গেছেন। সাহেবকে আগে না দিয়ে সে আমাদের জন্য কিছুই করবে না।

একটা থালায় কিছু পেঁয়াজ কুচোনো ছিল। বসে বসে সেই কাঁচা পেঁয়াজই দাঁতে কাটতে লাগলুম খিদের জ্বালায়। তারপর যখন চৌকিদার ভাত বেড়ে দিল, প্রায় চক্ষের নিমেষে তা উড়ে গেল। কম দেয়নি। অনেকটা ভাত। দু'টুকরো মাংস আর ঝোল দিয়েই তা চেটেপুটে সাফ করে দিলাম। বাড়িতে আমরা কোনোদিন এত ভাত খাই না। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, আর একটু পেলে ভালো হতো।

আর সেই মুর্গীর মাংসের স্বাদ কী অপূর্ব। জীবনে সেই প্রথম। আজও মনে হয়, সেদিন সেই মুর্গির মাংসের স্বাদ যেমন চমৎকার ছিল, তেমন রান্না আর সারা জীবনে খাইনি।

তারপর কিছুক্ষণ আমরা দুর্গের ওপটায় ঘুরে বেড়িয়ে, এক সময় ঠিক করলাম, পাহাড়ের উল্টো দিক দিয়ে নামবো। বেশ খাড়া পাহাড়, নীচেই গঙ্গা।

আমরা পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে নামতে লাগলাম। বেশ ভয় ভয় করছে। পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামাটাও কম শক্ত নয়। একবার পা পিছলোলেই গড়িয়ে পড়ে যাবো।

অজয় বললো, এই মুন্নি তুই আমার হাত ধরে থাক। মুন্নি বললো, না। আমি ঠিক পারবো। তুই অতনুকে দ্যাখ না।

সত্যিই, অতনুই অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। বাচ্চা ছেলের মতন টলে টলে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, মুখখানা একদম ফ্যাকাসে। খুবই ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ও তো বাংলাদেশের ছেলে, পাহাড় কখনো দেখেইনি বোধহয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিরে অতনু পারবি তো?

অজয় বললো, অতনু, তুই এক কাজ কর বরং তুই ফিরে যা। ওপাশের রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে যা, তারপর ঘুরে ঐদিকটায় এসে দাঁড়িয়ে থাক। ততক্ষণে আমরা নামছি—

কিন্তু সেটা অতনুর পক্ষে অপমানের। মুন্নিও যদি পাহাড় দিয়ে নামতে পারে তাহলে সে কি করে ভয় পেয়ে ফিরে যাবে?

অতনু জেদ ধরে বললো, না, আমি ঠিক পারবো!

আমি অতনুর কাছাকাছি রইলাম। অতনুর কিছু একটা হলে তো বাড়িতে ফিরে আমাকেই বকুনি খেতে হবে!

সেদিন আমরা একটা একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম একটুর জন্য। না, অতনুর জন্য কিছু হয়নি। বেশী বেশী ফরফর করতে গিয়ে মুন্নিটাই কাণ্ডটা বাধালো।

পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গাটা ঢালু। সোজা হয়ে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। আমরা তখন উল্টো দিকে ফিরে প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতন করে নামছিলাম। মুন্নিটা বেশী সাহস দেখিয়ে সোজা হয়ে নামতে গেল, অমনি পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। তারপর গড়াতে লাগলো। আমরা আঁতকে উঠলাম। মুন্নি আর নিজেকে সামলাতে পারছে না, থামতেও পারছে না। কোনো একটা বড় পাথরে গিয়ে ধাক্কা খাবে, তাতে নিশ্চয়ই মাথা ফাটবে কিংবা হাড়গোড় ভাঙবে!

অজয় ছিল মুন্নির কাছাকাছি। ও মুন্নিকে ধরার জন্য একটা ডাইভ মারলো। সেটাও একটা সাংঘাতিক কাজ, ঐ অবস্থায় নিজেকে বাঁচানোও শক্ত, কিন্তু অজয়ের প্রচণ্ড সাহস। অজয় মুন্নিকে ধরে ফেললো ঠিক, কিন্তু থামাতে পারলো না, দু'জনেই একসঙ্গে গড়াতে লাগলো।

আমি চিৎকার করে চোখ বুজলুম।

আবার চোখ খুলে দেখি অজয় আর মুন্নি দু'জনই একটা বড় পাথরের কাছে থেমে আছে। মনে হলো নড়ছে চড়ছে না। আমি বোকার মতন সেদিকে ছুটে যাচ্ছিলাম। তখন অতনুই আমার হাত চেপে ধরে বললো, আস্তে! খবর্দার দৌড়োবে না!

আশ্চর্যের ব্যাপার, ওরকম একটা দুর্ঘটনার পরও ওদের দু'জনের বিশেষ কিছু লাগে নি। অজয় বড় পাথরটার দিকে নিজের পিঠ দিয়ে বাঁচিয়েছে, একটা জোর ধাক্কা লেগেছে বটে, কিছু ভাঙে টাঙেনি। ওর হাতের আরও দু'এক জায়গায় ছড়ে গেছে, কিন্তু মুন্নিকে ও বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল বলে, মুন্নির কিছুই লাগেনি বলতে গেলে।

হঠাৎ আমরা সবাই এক সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলাম। যেন সবটাই একটা মজার ব্যাপার। এই যে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে এরকম গড়িয়ে পড়া। মরতে মরতেও বেঁচে যাওয়া—এগুলো মজার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই না। বড় পাথরটার ধারে বসে আমরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম।

পাহাড় থেকে নামতে বিকেল গড়িয়ে এলো। এখানে গঙ্গার ধারটা অনেক সুন্দর। বেনারসের মতন ঘিঞ্জি নয়। পাল তোলা নৌকো রয়েছে কয়েকটা—এক টাকা দু'টাকা দিলেই গঙ্গার ওপর অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে আনছে। আমাদের সে-রকম লোভও হয়েছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যের অন্ধকার হয়ে এলো বলে আমরা আর সাহস করলাম না। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। সন্ধ্যে হলেই বইখুলে পড়তে বসার কথা মনে পড়ে। বাবা এতক্ষণ বাড়ি ফিরে এসেছেন।

এখান থেকে রেল স্টেশন বেশ অনেকটা দূরে। আসবার সময় বাসে খুব ভিড় ছিল, তাই ফেরার সময় ট্রেনেই যাবো ঠিক করেছিলাম। আমাদের টাকা পয়সা বেশী নেই, তাই আর টাঙ্গা নিলাম না। হেঁটেই এগোলাম স্টেশনের দিকে।

ঠিক সাতটা বেজে দশ মিনিটে স্টেশনে পেঁীছে শুনলাম, দশ মিনিট আগে ট্রেন ছেড়ে গেছে। আর বেনারসের ট্রেন নেই রাত্তিরে। চুনার ছোট জায়গা, এখান থেকে বেশী ট্রেন চলে না।

আমাদের তো একা একা বেড়াবার অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই আমরা ফেরার ট্রেনের খবর আগেই নিয়ে রাখি নি ; এ সব চিন্তা তো আগে কখনো করতে হয় নি।

অজয় বললো, চল তা হলে বাসেই যাবো

বাস ডিপোতে এসে দেখলাম সে জায়গাটাও ফাঁকা। সন্ধ্যের পর এখান থেকে বাস যায় না। কেনই বা যাবে, যাত্রী কোথায়? আমরা চারজন ছাড়া তো আর কেউ নেই। আমার বুকে ধড়াস ধড়াস শব্দ হতে লাগলো।

তা হলে আমরা ফিরবো কি করে? অনেক ভেবে চিন্তেও দেখা গেল, কোনো উপায় নেই। বাস ডিপোর একজন লোক বললে এদিকের রাস্তায় রাত্তিরের দিকে গুণ্ডার ভয় আছে—বেশী ঘোরাঘুরি করবেন না, কোনো ধর্মশালায় থেকে যান।

আমরা রাত্তিরে ফিরতে পারবো না? এ কখনো হয়? এরকম তো গল্পে হয়! আমাদের চেনাশোনা যত লোক আছে কেউ তো কখনো কোনো জায়গায় এরকম আটকে যায়নি। সবাই ঠিক ঠাক সময়ে ফিরে এসেছে। আর প্রথমবার বেড়াতে এসে আমাদেরই এরকম হবে? ঠিক যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

রাত্রে বাড়ি না ফিরলে যে কি হবে, তা যেন চিন্তাই করতে পারছি না। মা বাবা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবেন। অজয়ের জন্য তো নিশ্চয়ই থানায়-থানায় খবর দিয়ে তোলপাড় করা হবে একেবারে

চিন্তায় আমাদের মুখ শুকিয়ে গেছে। তবু এর মধ্যে মুন্নি বললো, ভালোই তো হলো, আমরা বেশ ধর্মশালায় থাকবো। সবাই মিলে একটা ঘরে।

মুন্নিটা একেবারে ছেলেমানুষ, বিপদ আপদও বোঝে না। অজয় ওকে এক ধমক দিয়ে বললো, চুপ কর!

মুন্নি বললো, ফেরার যখন কোনো উপায় নেই, তখন সারারাত কি আমরা রাস্তায় থাকবো? একটা কোনো ধর্মশালা নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা ঘর পেলেই চলে যাবে আমাদের।

আমি বললাম, আঃ, মুন্নি, কী পাগলের মতন কথা বলছিস? আমরা এখানে সারারাত থাকবো? তারপর বাড়ি ফিরলে কি হবে।

মুন্নি বললো, সে যা হবার তা হবে। আমার তো এখন বেশ মজাই লাগছে। তোরা এত ভয় পাচ্ছিস কেন?

অজয় অত্যন্ত গোঁয়ার ছেলে। ও ঠিক করলো, হেঁটেই আমরা রওনা দেবো বেনারসের দিকে। অন্তত ভোর হবার আগে নিশ্চয়ই পেঁীছে যাবো—কিংবা খানিকটা দূরে গিয়ে যদি অন্য রুটের কোনো বাস পাওয়া যায়, তাহলে তো আরও ভালো। আর, রাস্তায় গুণ্ডার ভয়? আমরা কাশীর ছেলে, গুণ্ডা দেখা আমাদের অভ্যেস আছে। আমাদের কাছে তো বেশী টাকা পয়সা নেই, গুণ্ডারা আমাদের কি করবে?

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাস্তা দিয়ে আমরা চারজনে হাঁটতে লাগলাম। কারুর মুখে একটাও কথা নেই। সকলেরই বুক দুপ দুপ করছে। এরকম ভাবে হেঁটে কি আমরা পেঁীছোতে পারবো? কত মাইল দূরে তাই বা কে জানে। আমরা শুধু শুনছি আমাদের পায়ের শব্দ। এ রাস্তায় আর একটা মনুষ নেই, আর কোনো গাড়ি ঘোড়াও চলে না।

খানিকটা বাদে একটা গাড়ির হেড লাইটের অলোয় অন্ধকার চিরে গেল। গাড়িটা আসছে আমাদের পেছন দিক থেকে। এই গাড়িতে একটু জায়গা হবে না? আমাদের জায়গা দিতেই হবে।

আমরা রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গাড়িটা একটু দূরে এসে থামলো। একটা জিপ। জানলার পাশে একটি চেনা মুখ সেই এস. ডি. ও. সাহেব।

অমরা চারজনে মিলে একসঙ্গে কথা বলতে গেলুম বলে এমন চ্যাচামেচি হয়ে গেল যে উনি প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না

তারপর বললেন, তোমরা বেনারস যাবে, অথচ ট্রেনের খোঁজ রাখো নি? ছি, ছি এখন কি হবে।

আমরা বললাম, আপনি দয়া করে আপনার গাড়িতে আমাদের একটু পেঁছে দিন। আমাদের ভীষণ বিপদ।

উনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, অসম্ভব। ইমপসিবল্।

আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এস. ডি. ও. সাহেবকে দেখে ভেবে ছিলাম, উনি ভালো লোক, আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। আমরা বেঁচে গেলাম। আর উনিই বলছেন কিনা, অসম্ভব?

এস. ডি. ও. সাহেব চিন্তিত, মুখে বললেন, রাস্তা খারাপ, তোমরা রাত্রে কোথায় ঘুরবে?

আমাদের অভিমান হয়েছে, আমরা আর ওঁর সঙ্গে কোনো কথা বললাম না।

উনি বললেন, আমাকে সাড়ে আটটার মধ্যে মীর্জাপুরে পেঁছাতেই হবে, কালেকটর সাহেব আসবেন। নইলে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আসতাম। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্। তোমারাও আমার সঙ্গে মীর্জাপুর চলো।

কোথায় বেনারস আর কোথায় মীর্জাপুর। আমরা সেখানে গিয়ে কি করবো?

উনি বললেন, চলো, দেখা যাক, কি করা যায়।

আমরা জিপ গাড়ির পেছন দিকে উঠে বসলাম। লোকটি সত্যিই ভালো। আমরা বিপদে পড়ে খুব ঘাবড়ে গেছি দেখে উনি নানা-রকম হাসি ঠাট্টায় আমাদের ভোলাবার চেষ্টা করলেন। অনেক প্রশ্ন করে জেনে নিলেন আমাদের বাড়ির কথা। তারপর এস. ডি. ও. সাহেবকে মীর্জাপুরে নামিয়ে সেই গাড়ি যখন আমাদের বেনারস পেঁছে দিল, তখন রাত এগারোটা।

আমি আর অতনু চোরের মতন আমাদের বাড়ির দিকে এগোলাম। সদর দরজা খোলাই ছিল। আমরা কোনোরকম শব্দ না করে ঢুকলাম ভেতরে। তবু বাবা কি করে যেন টের পেয়ে

গেলেন। ছুটে এসে আমার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন উঠোনে। তারপর কি মার। উফ্। বাবার ওরকম নিষ্ঠুর চেহারা কখনো দেখিনি। আমার চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, দাঁত গুলো ভেঙে পড়তে পারে—সেদিকে বাবার একটুও খেয়াল নেই—মুখের ওপরেই দুমদাম করে মারতে লাগলেন। আমি চোখ মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লাম। আর খালি হাউ হাউ করে বলতে লাগলাম, আর করবো না, আর করবো না।

মা এসেও বাবাকে কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারে না। মা বাবার হাত দুটো ধরে ফেলেছেন। তবু বাবা আমাকে লাথি মারতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তুই মরে যা! এমন কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাও ভালো।

বাবা অতনুকে মারেন নি। শুধু একবার তিক্ত গলায় বলেছিলেন, তুমিও এই হতভাগার সঙ্গে মিশে মিশে গোল্লায় যাচ্ছো? তোমাকে তো ভালো ছেলে বলে জানতাম!

বাবা সেদিন আমাকে অনেকগুলো খারাপ কথা বলেছিলেন। বলতে গেলে, সেদিনই আমি ছেলেমানুষ থেকে সাবালক হয়ে গেলাম। আমি পৃথিবীটাকে চিনতে শিখলাম। বাবা মা'রাই ছোটোদের সব খারাপ কথা শিখিয়ে দেয়।

সারাদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকার জন্য বা অতরাত্রে বাড়ি ফেরার জন্য সেদিন আমি মার খাইনি। মার খেয়েছিলাম অন্য কারণে। বাবা আমাকে মারতেই বারবার বলছিলেন, আমি আর অজয় নাকি অত্যন্ত অসভ্য হয়ে গেছি। আমার জোর করে মুন্নিকে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছি। আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে মুন্নির সঙ্গে অসভ্যতা করেছি। আমরা এতদূর বখাটে হয়ে গেছি যে মুন্নির ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করিনি। চারিদিকে ছি ছি পড়ে গেছে, এরপর মুন্নির বিয়ে হবে কি করে?

মুন্নির সঙ্গে সারাদিনে যে আমারা কী অসভ্যতা করেছি, তা আমার মাথায় ঢুকলো না। মুন্নি নিজে ইচ্ছে করে আমাদের সঙ্গে

গেছে। এর সঙ্গে মুন্নির বিয়ে হবার কী সম্পর্ক তা-ও জানি না। তবে এটা বুঝলাম, অর্থাৎ বাবা জোর করে বুঝিয়ে দিলেন, যে মুন্নি মেয়ে আমরা ছেলে—এটা একটা বিরাট তফাৎ। মুন্নির সঙ্গে আমাদের শুধু অসভ্যতারই সম্পর্ক হতে পারে, বন্ধুত্ব হতে পারে না!

মুন্নির বাবা আর দাদা আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কেন তা জানি না। ওঁরাই সারাদিন ধরে মুন্নিকে খুঁজে না পেয়ে সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমার বাবার কাছে এসে ওঁরা দারুণ অপমানজনক সব কথা শুনিয়ে গেছেন। সেইজন্যই বাবা অত রেগেছিলেন।

সে রাত্রে আর ঘুম এলো না। সারা রাত চোখ শুকনো করে জেগে রইলাম। টের পাচ্ছিলাম, পাশের বিছানায় অতনুও জেগে। কিন্তু কোনো কথা বলিনি। একই সঙ্গে আমরা বেড়াতে গেছি, কিন্তু আমি মার খেয়েছি আর ও খায়নি বলে ও নিশ্চয়ই খুব অপরাধী বোধ করছিল আমার কাছে।

সারা রাত জেগে জেগে আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে আমাকে কেউ ভালোবাসে না। আমার বাবা কিংবা মা-ও আমি মরে গেলেই বাঁচে। এখন খুব একটা শক্ত অসুখ হয়ে আমি মরে গেলেই ভালো হয়। যদি সেরকম ভাবে না মরি, তা হলে কি একদিন বেণী মাধবের ধ্বজার ওপর থেকে ঝাঁপ দেবো? কিংবা তারও দরকার নেই। আর কয়েকটা মাস তো মোটে! পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো; অনেক দূরের কোনো দেশে—যেখানে মা কিংবা বাবা কোনদিনই আর আমার সন্ধান পাবে না। আমি নামটামও বদলে অন্য রকম একটা মানুষ হয়ে থাকবো। কোনো একটা পাহাড়ী নদীর ধারে বসে থাকবো সারাদিন।

অজয় ওদের বাড়ির খুব আদুরে ছেলে। সে রাত্রে অজয়ও খুব মার খেয়েছিল, ঐ মুন্নির দাদা-বাবার জন্যই। তারপর থেকে ওদের দু'বাড়ির মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

মুন্নির সঙ্গে আমাদের ব্যবহারটাও বদলে গেল। মুন্নি আর অজয়দের বাড়ি আসে না। ও বাড়ির ছাদ থেকে আমরা যখন ঘুড়ি ওড়াই তখন পাশের বাড়ির ছাদে মুন্নির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেও আমরা আর কথা কথা বলি না; মুখ ফিরিয়ে নিই। প্রথম কয়েকদিন মুন্নির ওপর আমাদের খুবই রাগ ছিল। ওর জন্যই আমরা এত মার খেয়েছি। আমাদের তো দোষ ছিল না। কিছু-দিন কাটবার পর আমরা বুঝতে পারি, মুন্নিরও তো খুব দোষ নেই। ও একটু জেদী আর ছেলেমানুষ ধরণের—ও কি আর বুঝেছিল যে ব্যাপারটিকে সবাই এত খারাপ ভাববে! মুন্নির তের বছর বয়স, কিন্তু বুদ্ধি একটুও পাকেনি।

এক সময় আমি টের পেলাম, মুন্নির জন্য আমার মন কেমন করে। ও অনেক জ্বালাতন করতো, আমাদের অনেক বিপদে ফেলতো ঠিকই, তবু ওকে নিয়মিত দেখাটাও যেন আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। মুন্নি আর আমাদের দলে নেই, সেই জন্য সব সময় একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে!

এর পর থেকে মুন্নির চেহারাও যেন বদলে গেল। মুন্নি ছেলেদের মতন শার্ট প্যান্ট পরে থাকতো। কিন্তু বাদলদা সেই সব জামা প্যান্ট জোর করে ফেলে দিয়েছেন। মুন্নি এখন শাড়ি পরে। সেইজন্য ওকে হঠাৎ বড় দেখায়। এখন বোঝা যায়, মুন্নি বেশ লম্বা। অবশ্য ওর মাথার চুল এখনো ছোট ছোট হয়ে রয়েছে। চুল বড় হতে সময় লাগবে।

আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন অফুরন্ত ছুটি। এখন সকাল-বিকেল আমি আর অজয় বেঙ্গলি লাইব্রেরিতে বসে থাকি। অতনুকে এখনো স্কুলে যেতে হয়।

লাইব্রেরিয়ান অনিমেষদা দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন। একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরেন। তাই ওকে অনেকটা সাধু-সাধু দেখায়। কথাবার্তাও বলেন খুব আস্তে আস্তে। অজয় আমাকে ফিসফিস করে বলে, তোর দিদির সঙ্গে বিয়ে হবে না, তাই অনিমেষদা সাধু হয়ে যাচ্ছেন। কথাটা আমার সত্যি বলেই মনে

হয়। এক একদিন আমার মনে হয়, আমিও এক সময় অনিমেষদার মতন সাধু হয়ে যাবো।

দিদির আর এক প্রেমিক সাইকেল স্টোর্সের ভাস্করদা সম্পর্কেও একদিন একটা খুব খারাপ খবর শোনা গেল। ভাস্করদার নাকি টি বি! ভাস্করদার মতন গাঁট্টা জোয়ান মানুষেরও টি বি হয়? কী অদ্ভুত কথা! টি বি তো হয় গরীবদের আর খুব রোগা লোকদের! ভাস্করদা গরীবও নয়, রোগাও নয়। এ পাড়ার হীরো, তারই কিনা টি বি! অজয় এ সম্পর্কেও আমাকে বলেছিল, তোর দিদির সঙ্গে বিয়ে হলো না কিনা, তাই ভাস্করদা বুকে আঘাত পেয়েছেন তো। সেই জন্যই টি বি হয়ে গেল। আমার মনে হলো, হয়তো অজয়ের কথাটাই সত্যি। আমারও হঠাৎ একদিন টি বি হয়ে যাবে না তো? আমিও তো সব সময় একজনের কথা ভাবি। যদি তাকে না পাই······

আর এক মাস বাদেই দেবাশিষদার সঙ্গে দিদির বিয়ে। দিদি যে আর দুজন পুরুষের মনে এরকম আঘাত দিয়েছে তার কোনো হুঁসই নেই। দিব্যি হাসি খুশী ডগমগ হয়ে আছে। অনিমেষদা বা ভাস্করদার নামও উচ্চারণ করে না কক্ষনো। ওদের দুজনের কথা ভেবে আমারই কষ্ট হতো। দিদির বিয়েটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়। দিদি এবাড়ি থেকে চলে গেলে আমার একটুও কষ্ট হবে না। দিদি আমাকে কখনো ভালোবাসেনি!

বেঙ্গলি লাইব্রেরির বেঞ্চে বসে বসে সকালবেলা আমি আর অজয় মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাই। হঠাৎ এক সময় দুজনেই চোখ তুলে তাকাই রাস্তার দিকে। সেই সময় মুন্নি স্কুলে যায়। নীল রঙের শাড়ি পায়ে হিল লাগানো জুতো, যদিও চিবুকটা উঁচু করে অহংকারীর মতন হাঁটে। আমাদের দিকে তাকায় না। ও ঠিকই জানে আমরা লাইব্রেরিতে বসে আছি, তবু এদিকে তাকাবে না। এই সেই মুন্নি, কয়েকমাস আগেও যে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল।

সেদিনের ঘটনার পর আমরা নিজেরাই মুন্নিকে এড়িয়ে চলতাম।

সেই জন্যই মুন্নির অভিমান হয়েছে, সেও আমাদের সঙ্গে আর কথা বলে না।

আমার বুকের মধ্যে টনটন করে! আমি হঠাৎ একদিন বুঝতে পারি যে মুন্নিকে বাদ দিয়ে আমি ঠিক বাঁচতে পারবো না! মুন্নি আমার খুবই আপন। যে করেই হোক একদিন মুন্নির সঙ্গে দেখা করে ওর হাত ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

অজয় হঠাৎ একদিন বললো, শোন্ বাপ্পা, তোর সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে!

প্রত্যেকদিন দুবেলা দেখা হয়। অজস্র কথা হয়, তবু আবার প্রাইভেট কথা কি?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি? বল্ না!

—এখানে নয়। এখানে ওসব কথা হবে না।

অজয় আমাকে নিয়ে এলো মণি কর্ণিকার ঘাটে! শ্মশানটা এখন ফাঁকা, কোনো চিতা জ্বলছে না। কোনো লোকও নেই। জলের মধ্যে যে আধ ডোবা মন্দিরটা আছে, অজয় তার আড়ালে নিয়ে এলো আমাকে। তারপর বসলো, শোন্ বাপ্পা, তোকে একটা কথা বলবো, তুই পৃথিবীতে আর কারুকে বলবি না?

—কি কথা?

—কারুকে বলবি না। প্রতিজ্ঞা কর। এই জল ছুঁয়ে বল্।

—বলছি তো। কী এমন কথা?

অজয় তবু চট করে বলতে পারলো না। মুখ নীচু করে রইলো। মুখখানা লালচে হয়ে গেছে, কোনো কারণে ও খুব লজ্জা পেয়েছে।

আমি ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বললাম, কি হয়েছে রে অজয়? খুলে বল্ তো!

অজয় এবার খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেললো, শোন, আমি মুন্নিকে ভালোবাসি। আই লাভ হার মোর দ্যান আই লাভ মাই লাইফ। মুন্নিকে ছাড়া আমি বাঁচবো না!

॥ ৫ ॥

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকে আমরা বড়োদের বই পড়ার অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম। শিগগির আমরা কলেজে পড়তে যাবো, অর্থাৎ আমরা বড়োদের জগতে চলে এসেছি। আমরা মানে আমি আর অজয়। অতনু এখনো ক্যাসটেন-এ পড়ে, সে ছোটই রয়ে গেছে।

আমার বাবা আমার গল্পের বই পড়া কখনো পছন্দ করতেন না। হাতে কখনো কোনো গল্পের বই দেখলেই ধমকে দিয়ে বলতেন, 'পড়াশুনো না করে শুধু নভেল নাটক পড়া হচ্ছে।' পড়াশুনো মানে শুধু ইস্কুল পাঠ্য বই পড়া। কিন্তু এখন যতদিন না রেজাল্ট বেরোয়, আমাদের অবিমিশ্র ছুটি, এখন গল্পের বই পড়লেও আমাদের কেউ বকতে পারে না।

বেঙ্গলি লাইব্রেরি থেকে আমি আর অজয় রোজ দুটো করে বই নিয়ে আসি। দু'জনে বদলা বদলি করে পড়ি। মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা স্কট-এর একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। তাতে এক জায়গায় আছে নায়ক ইমানুয়েল সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে পড়েছে একটা দুর্গের মধ্যে, পাঁচ ঘণ্টা লুকিয়ে রইলো একটা অন্ধকার কুঠুরিতে, তারপর রাত্তিবেলা উঠে এলো ওপরে। নায়িকা বেলিন্ডার ঘরের দরজা বন্ধ। নায়ক ইমানুয়েল ব্যালকনি টপকে বাইরের দেয়ালের আঙ্গুরলতা ধরে ধরে চলে এলো বেলিন্ডার ঘরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডের কাছে। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়লো। পালঙ্কের ওপর বেলিন্ডা ঘুমোচ্ছে, সে অসুস্থ। ইমানুয়েল তার পায়ের কাছে বসে রইলো চুপচাপ, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। এক সময়, বেলিন্ডা চোখ মেললো। ইমানুয়েলকে দেখে ভয় পেয়ে বললো, তুমি কেন এসেছো? তুমি চলে যাও! কেউ জেনে যাবে, কেউ তোমায় দেখে ফেলবে, তা হলে আর তুমি প্রাণে বাঁচবে না!

ইমানুয়েল তখন বেলিন্ডার একটা হাত জড়িয়ে ধরে, মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে বলেছিল, আই লাভ ইউ মোর দ্যান আই লাভ মাই লাইফ!

লাইনটা আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। বারবার উচ্চারণ করেছিলাম। প্রত্যেকেই নিজের জীবনটাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। কিন্তু যদি আর কারুকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালোবাসা যায়? দারুণ, না? আমার খুব গোপনে ইচ্ছে হয়েছিল এই কথাটা আমিও একদিন একজনকে বলবো। এখন নয়, মুন্নির যখন অসুখ হবে, আমি লুকিয়ে চলে যাবো ওদের বাড়িতে, ওর খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ·····

অজয় সেই কথাটা আগেই বলে দিল? আমার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আমি চট্ করে কোনো কথা বলতে পারলাম না।

আমরা জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়ে আছি। গঙ্গার জল ছুঁয়ে কোনো মিথ্যে কথা বলা যায় না। অজয়ের কথাটা আর ফেরানো যাবে না। অজয় সেই জন্যই আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

অজয় বললো, জানিস দু'দিন ধরে আমার ভাত খেতেই ইচ্ছে করছে না।

—কেন?

—আমার মন খারাপ হয়ে আছে। মুন্নি আমার সঙ্গে কথা বলে না। পরশুদিন আমাদের বাড়ির জানালা দিয়ে ওকে ডাকলুম ও উত্তরই দিল না।

—আমরাই তো আগে কথা বলা বন্ধ করেছি।

—মুন্নির বাবাটা মহাপাজী—

—জানি।

—প্রত্যেকদিন মুন্নিকে দারুণ বকে। আমাদের বাড়ি থেকে সব শোনা যায়। ওরা মুন্নিকে এত কষ্ট দেয়, আমরা তার জন্য কিছু করবো না?

আমি চুপ করে রইলাম।

অজয় আবার বললো, সেদিন চুনারে……মুন্নি যখন পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছিল গড়িয়ে, আমি ছুটে গিয়ে ওকে বাঁচালাম ? তারপর থেকে আমার মনে হচ্ছে··মুন্নির কখনো কোনো বিপদ হলে আমি সবসময় ওকে বাঁচাবো। আমি কি ঠিক করেছি জানিস ?

—কি ?

—আমি একদিন মুন্নিকে নিয়ে কোথাও চলে যাবো।

—কেন ?

—মুন্নিরা ব্রাহ্মণ, ওর বাবা দারুণ গোঁড়া—আমরা কায়স্থ, আমার সঙ্গে মুন্নির বিয়ে দিতে ওরা রাজি হবে না।

আমার টপ করে মনে হলো, আমরা তো ব্রাহ্মণ। অজয়ের তুলনায় আমার অনেকখানি সুবিধে আছে। পরক্ষণেই ভাবলাম, ছি ছি, আমি কখনো এ রকম সুযোগ নিতে পারি ? অজয় আমার বন্ধু না ?

অজয় বললো, কায়স্থ হলেই খারাপ ? কায়স্থ মানে তো ক্ষত্রিয়—বামুনদের থেকে অনেক বড়। যাই হোক, মুন্নির বাবা রাজি হবেই না জানি! তাই মুন্নিকে নিয়ে আমি পালাবো-তুই আমাকে সাহায্য করবি না, বাপ্পা ?

—কোথায় যাবি ?

—রাজস্থান। আমার খুব ইচ্ছে জয়পুরে গিয়ে থাকবো।

—টাকা কোথায় পাবি ?

—চাকরি করবো।

তারপর একটু থেমে অজয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো তোকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তুই যাবি ? আমারা বেশ তিনজনে মিলে থাকবো।

আমি একটু হাসলাম। এ পর্যন্ত যতগুলো বড়োদের বই পড়েছি সব কটাতেই দেখেছি একজন নায়ক আর একজন নায়িকা থাকে।

দু'জন নায়ক কোথাও থাকে না। আর একজন থাকে ভিলেন। আমি তো আর অজয়ের শত্রু হতে পারি না!

হঠাৎ অতনুর গলা শুনতে পেলাম। ঘাট থেকে ও আমাদের নাম ধরে ডাকছে। বিকেলবেলা ও আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে।

অজয় ফিসফিস করে বললো, অতনুটাকে কিন্তু কিছু বলিস না। পৃথিবীতে আর কেউ যেন এসব কথা জানতে না পারে।

এরপর কিছুদিন অজয়ের পরিকল্পনাটা চাপা পড়ে গেল। আমার দিদির বিয়ে উপলক্ষে আমরা মেতে উঠলাম।

খুব হৈ চৈ হয়েছিল দিদির বিয়েতে। আমাদের বাড়িতে জায়গা কম, তার মধ্যেই গিসগিস করতে লাগলো মানুষজন। বাড়িওয়ালা দোতালার ছোট ঘর ছেড়ে দিল, ছাদে মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হলো, আমি, অতনু আর অজয় ঘুরে ঘুরে বেনারসের চেনাশুনো সব লোককে নেমন্তন্ন করে এলাম। এলাহাবাদ থেকে আমার দুই পিসী এলো একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে।

দেবাশিসদারা একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছে গোধুলিয়ায় দেবাশিসদার মাকে দেখে আমারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম সবাই। দেবাশিসদা লম্বা, ওর বাবাও লম্বা, কিন্তু মায়ের একেবারে ছোট্ট-খাট্টো চেহারা। টুকটুকে ফরসা, মথার চুল একটাও পাকেনি, সব সময় হাসি হাসি মুখ, ঠিক যেন একটা জাপানী পুতুল। মোটেই মা-মা মনে হয় না। ওকে দেখলেই বোঝা যায়, উনি জীবনেও কাউকে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলেন নি। পিসীরা আমার দিদিকে বলেছিল, তোর কত ভাগ্য যে এমন শ্বাশুড়ি পাবি।

মা চেয়েছিল দিদির বিয়েতে শানাই পার্টি আনতে। কিন্তু বাবা অত খরচ করতে রাজি হননি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বরের গাড়ি যখন এলো, ঠিক সেই সময় রেডিওতে শানাই বাজছিল। বাড়িওয়ালার রেডিও, পাড়ার অন্য অন্য বাড়ির রেডিও তখন

খোলা—সমস্ত পাড়া জুড়ে শানাই বাজছে। মনে আছে, আমরা তখন অনেকে মিলে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম।

সেদিন অন্তত একশো বার সিঁড়ি দিয়ে ওপর নীচ করতে হয়েছিল আমাদের। পরিবেশন করা ছাড়াও মাঝে মাঝেই কেউ বলেছে, এই ওমুককে ডেকে নিয়ে আয় তো—অমনি ছুটতে হয়। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো রাত সাড়ে এগারোটার সময়। তারপর আমাদের আর কিছু ইচ্ছে করলো না। শরীর এত ক্লান্ত যে খাবারে রুচি নেই। পরিবেশনের সময় মাঝে মাঝে দু' একটা মাছ ভাজা কিংবা সন্দেশ চেখে দেখেছি, তাতেই হয়ে গেছে।

আমি, অজয় আর অতনু রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। বিয়ের লগ্ন পৌনে দুটোয়, অনেকেই বিয়ে দেখে যাবে বলে তখনো রয়ে গেছে। বিশেষ করে মেয়েরা।

অজয় বললো, একটা পান খেলে হতো।

আমি অতনুকে বললাম, অতনু যা তো, মায়ের ঘরে থালায় অনেক পান সাজা আছে, তিনটে খিলি নিয়ে আয়তো।

অতনু বাধ্য ছেলের মতন চলে গেল! অজয় চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মুন্নিকে দেখিছিস? কী দারুণ সেজেছে। মুন্নির কি করে এত লম্বা চুল হলো?

সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময় মুন্নিকে আজ দেখেছি কয়েকবার। একটা কচি কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি পরলে ওকে অনেক বড়ো বড়ো লাগে। দু' একবার আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমি সামান্য হেসেছি, মুন্নি তার উত্তরে হেসেছে কিনা বোঝা যায় নি। অত ভিড়ের মধ্যে কথা বলার তো উপায় নেই। মুন্নি মেয়েদের দলে মিশে আছে দেখেও অবাক লাগে। যতবার মুন্নিকে দেখেছি আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠেছে।

অজয় বললো, মুন্নি কি রকম অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছে, না রে?

—সত্যিই তাই।

—ও কি আর আমাদের সঙ্গে মিশবেই না? একটা কাজ করলে হয় না?

—কি।

—দাঁড়া, অতনু আসুক, বলছি। জানিস, আজকাল মুন্নিকে দেখলেই আমার একটা জিনিস হয়। হঠাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে। কেন বলতো?

আমি মুখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে রইলাম। আমার শরীর কাঁপছে।

অজয় বললো, এই দ্যাখ না, মুন্নির কথা বললাম তো, আমার হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

অজয় ফস্ করে পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, আজ একটা সিগারেট খাবি?

আমি বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকালাম। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবো? অজয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

বরযাত্রীদের আমরাই সিগারেট বিলি করেছিলাম। দুটো একটা প্যাকেট বেশী রয়ে গেছে। অজয় কখন সেই একটা প্যাকেট নিজের পকেটে নিয়ে এসেছে।

একটা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য একটু লোভও হলো। ষোল বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখন একটা সিগারেট খেলে দোষ কি আছে?

—চল, গঙ্গার ঘাটের দিকে একটু নিরিবিলি দেখে—

এই সময় অতনু এসে গেল। আমরা পান চিবুতে চিবুতে গঙ্গার দিকে এগোলাম। মাঝে মাঝে আড় চোখে অতনুর দিকে তাকাচ্ছি। সিগারেটের ব্যাপারটা কি অতনুকে জানানো ঠিক হবে?

অজয়ই বললো, অতনু আমি একটা সিগারেট খাবো, কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু। বাপ্পাও খাবে।

অতনু বললো, আমি খাবো না?

—না তুই তো ইস্কুলের ছেলে।

—বাঃ আমি তো বয়সে তোদের সমান—

—বেশী পাকামি করিস না। ইস্কুলের ছেলেরা কখনো সিগারেট খায়? আর এক বছর ওয়েট্ কর। তা বলে আমাদের কথা কাউকে বলে দিলে কিন্তু মাথা গুঁড়ো করে দেবো একেবারে।

অজয় আর আমি সিগারেট ধরিয়ে খুব কাসতে লাগলাম। চোখ লাল হয়ে এলো। মানুষ পয়সা খরচ করে এ জিনিস খেয়ে কি আনন্দ পায় কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার ভয় হলো। একটু বাদেই বাড়ি ফিরতে হবে। কনের পিঁড়ি ধরে ঘোরাবার সময় ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াবে। তখন যদি আমার মুখে গন্ধ পেয়ে যায়।

অজয় বললে, কিছু হবে না। আর একটা পান খেয়ে নিবি। তারপর অতনুর দিকে ফিরে হঠাৎ নরম গলায় বললো, অতনু একটা কাজ করবি ভাই?

—কি?

—মুন্নিকে একবার ডেকে আনতে পারবি?

—এখানে?

হ্যাঁ। বিয়ে বাড়ির গোলমালে কেউ খেয়াল করবে না। তোকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেও কেউ কিছু মনে করবে না। তুই তো ভালো ছেলে।

—মুন্নি যদি আসতে না চায়?

—ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পারবি না?

—যদি হঠাৎ রেগে ওঠে?

—গিয়েই দ্যাখ না। প্রথমেই দু' একটা কথা বলে বুঝে দেখবি আগে। যদি আনতে পারিস, তোকে একদিন আমি খাওয়াবো। মাইরি, খাওয়াবো।

অতনু আলতো পায়ে চলে গেল। একটু পরেই কিন্তু ফিরে

এলো মুন্নিকে নিয়ে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে, এক প্যান্ডার বড় ছাতার আড়ালে।

মুন্নিকে দূর থেকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগালো। এত জোরে যেন বাইরে থেকেও শোনা যাবে। এ রকম কেন হয়? মাত্র তিন চার মাস আগেও তো মুন্নিকে দেখলে কিছুই মনে হতো না।

মুন্নি আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। গম্ভীর। প্রথমে আমরা কেউই কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর অজয় সাহস করে জিজ্ঞেস করলো, মুন্নি তুই আমাদের ওপর রাগ করেছিস?

মুন্নি বললো, আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে কেন

—আমরা তোর ওপর অন্যায় করেছি। শুধু শুধু না বুঝে…

—এখন এখানে ডেকে আনা হয়েছে কেন?

অজয় থতোমতো খেয়ে গেল। আর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললো, এমনিই।

আমাদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকোলো মন্নি। তারপর বললো, তোরা বুঝি আজ সিগারেট খেয়েছিস? ঠিক গন্ধ পাচ্ছি।

অতনু তাড়াতাড়ি বললো, আমি খাইনি।

মুন্নি বললো—তুই খাসনি, জানি। তুই তো ভীতু।

মুন্নি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে, বললো, দে। আমাকে দে।

—কি?

—সিগারেট। আমিও একটা খাবো।

আমি স্তম্ভিত। মুন্নিটা বলে কি? এইখানে ও আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবে? এটা কি বিলেত নাকি? আমরা ধরা পড়লে তবু না হয় বকুনি খাবো। আর মন্নি ধরা পড়লে?

আমি বললাম, যাঃ, কি আজেবাজে বলছিস। মেয়েরা সিগারেট খায়?

আমাকে সিগারেট না দিলে আমি তোদের সঙ্গে কথা বলবো না।

অজয় মিথ্যে করে বললো, নেই, আমাদের কাছে আর নেই। দুটোই মোটে এনেছিলাম।

—তাহলে তোরা আমাকে ডেকে এনেছিস কেন?

—এমনিই, একটু গল্প করার জন্য—

—আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গল্প করতে ভালো লাগে না।

মুন্নি আমাদের ছাড়িয়ে জলের দিকে এগিয়ে গেল। দুটো সিঁড়ি নেমে গেল জলের মধ্যে। শাড়ি যে ভিজে যাচ্ছে সে খেয়াল নেই।

পূর্ণিমা কবে ছিল কে জানে। সেদিন আকাশে হালকা হালকা মেঘ আর অন্ধকার। হাওয়া বইছে জোরে।

ঘাটে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা। দু' একটাতে মাঝিরা ঘুমোচ্ছে, কয়েকটা এমনিই ফাঁকা পড়ে আছে।

মুন্নি জল থেকে উঠে এসে চুপি চুপি বললো, তোরা নৌকো বাইতে পারিস?

অজয় বললো, হ্যাঁ, আমি পারি।

চল না, একটা নৌকা চুপি চুপি খুলে নিয়ে আমরা চলে যাই।

—কোথায় যাবো?

—ওপারটা ঘুরে আসি।

এবার আমার হাসি পেয়ে গেল। মুন্নিটা একটুও বদলায়নি। শাড়ি পরুক, আর যাই পরুক, ও ঠিক আগের মতনই রয়ে গেছে। এত বকুনি খায় বাড়িতে, তবু ওর শিক্ষা হয় না। মাথার মধ্যে সব সময় গজগজ করছে নানারকম পাগলামি।

অজয় আগ্রহের সঙ্গে বললো, চল না, যাই। যাবি বাপ্পা?

আমি বললাম, মাথা খারাপ নাকি তোদের? এখন জোয়ারের সময়, দ্যাখ না, জল কতটা ওপরে উঠে এসেছে। এখন নৌকো সামলানো কি চাট্টিখানি কথা?

অজয় বললো, আমি ঠিক পারবো।

—যা, যা, বাজে কথা বলিস না। বিয়ের লগ্ন শুরু হলেই আমাদের খোঁজ পড়বে, তার মধ্যে ফিরতে না পারলে—

আমি বড় বেশী সাবধানী হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। আমি ওদের কিছুতেই যেতে দিইনি। পরে অনেকবার আমার মনে হয়েছে, কী এমন ক্ষতি হতো, যদি একটা নৌকো চুরি করে গঙ্গার ওপরে ভেসে পড়তাম তখন? না হয়, ফিরে এসে বকুনি বা মার খেতাম। কিন্তু সেই যে আনন্দ, আবছা অন্ধকারে মুন্নিকে নিয়ে নৌকোয় বেড়ানো—তা তো জীবনে আর কখনো পাওয়া হবে না!

অজয় একটু বাদে আমার কথা মেনে নিয়ে বলেছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। আজ আর দরকার নেই। তোকে আমি ঠিক নৌকোয় করে নিয়ে যাবো মুন্নি, আর একদিন।

আমরা আস্তে আস্তে ঘাট ধরে ধরে হাঁটতে লাগলাম। আবার আমরা মুন্নিকে আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। এক সময় মন্নি এলে আমরা বিরক্ত হতাম—আজ যে ও আমাদের ধন্য করে দিয়েছে।

একটু বাদে, অজয় আমার কাঁধে হাত দিয়ে একটু চাপ দিল। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও দারুণ দুঃখী দুঃখী ভাবে তাকালো। আমি মানেটা বুঝলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, কি?

অজয় কিছুই বললো না।

আর একটু বাদে, ও আবার থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো। যেন একটা বোবা মানুষ ভেতরের অশেষ যন্ত্রণা নিয়ে রয়েছে, কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না।

এবার আমি বুঝে গেলাম।

একেবারে ছোট্ট বয়েস থেকে অজয় আমার বন্ধু। আমি ওর মনের সব কথাই বুঝে ফেলি। অজয় একটু মুন্নির সঙ্গে একা

থাকতে চাইছে। মুন্নির হাত জড়িয়ে ধরে সেই ইংরিজি কথাটা বলবে। তাই ও আমার সাহায্য চায়।

আমি মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধি বার করার চেষ্টা করলাম। তারপর হঠাৎ অতনুকে বললাম, অতনু যজ্ঞের কাঠ কোথায় রেখেছিস?

অতনু বললো, আমি তো রাখিনি। তুই-ই তো কিনে এনে—

—এই রে, সে কাঠ কোথায় রেখেছি আমার তো মনে নেই। বিয়ে শুরু হয়ে গেলেই যে কাঠ লাগবে। চল্ তো খুঁজে দেখি। কাঠ পাওয়া না গেলে কেলেঙ্কারি হবে—এত রাত্রে—

আমি অজয় আর মুন্নিকে বললাম, তোরা, থাক, আমি আর অতনু একবার চট্ করে ঘুরে আসছি।

মুন্নি জিজ্ঞেস করলো, তোরা আবার আসবি তো?

—হ্যাঁ। এক্ষুনি।

—আমার খোঁজ যদি কেউ করে, বলবি, আমি বাড়ি চলে গেছি।

—আচ্ছা।

বেশী ব্যস্ততা দেখাবার জন্য আমি দৌড়োতে লাগলাম। অতনুও আমার সঙ্গে ছুটলো। খানিকটা দূর গিয়ে, আমি একবার পেছনে ফিরে তাকালাম।

মুন্নি আর অজয় খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। অজয় একটা হাত রেখেছে মুন্নির কাঁধে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ওদের শরীরের রেখা যেন মিশে গেছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস আটকাতে পারলাম না। আমার মনে হলো, ওরা দুজনে আমার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। আমি আর ওদের কাছাকাছি কোনদিন যেতে পারবো না।

॥ ৬ ॥

দিদির বিয়ে হয়ে যাবার কিছুদিন পর থেকেই আমাদের বাড়িতে বেশ একটা বড় রকম পরিবর্তন দেখা গেল। আমরা আগেও গরীব ছিলাম, এখন আরও বেশী গরীব হয়ে গেলাম। আমরা বরাবরই দুবেলা ভাত খেতাম, সেই সময় থেকে রাত্তিরে রুটি খাওয়া চালু হলো। প্রত্যেকদিনের বদলে একদিন অন্তর একদিন বাজার হয়, তাও মাছ আসে সপ্তাহে একদিন। খিদের চোটে আমরা সবই খেতাম, কিন্তু মা রুটি পছন্দ করতেন না, মাছ ছাড়া ভাতও খেতে পারতেন না। মা রাত্তিরের দিকে শুধু একখানা আধখানা রুটি দাঁতে কাটতেন। মা রোগা হয়ে যেতে লাগলেন।

দিদির বিয়ের জন্য বাবাকে অনেক ধার করতে হয়েছিল। দেবাশিসদারা বড়লোক, তাঁদের বাড়িতে দিদির বিয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে বাবা অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। এই সময় থেকেই বাবার বুকের ব্যথাটা শুরু হয়।

এরপর আবার একটা ব্যাপারে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। রেজাল্ট বেরুবার আর মাত্র সাত-আট দিন বাকি, বাবা হঠাৎ আফিস থেকে বাড়ি ফিরে আমাকে বললেন, বাপ্পা, কাল থেকে শর্টহ্যান্ড-টাইপরাইটিং ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যা।

শান্তি হোটেলের দোতলায় শর্টহ্যান্ড-টাইপরাইটিং ইস্কুলের একটা সাইন বোর্ড দেখেছি বটে। কিছু লোক সেখানে যাতায়াত করে। তাদের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, ধুতির সঙ্গে শার্ট পরে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। লোকগুলোকে দেখলেই মনে হয় গ্রাম্য গ্রাম্য, সেখানে আমি যাবো কেন?

বাবা বললেন, বিজয়চাঁদবাবু বলেছেন, আপনার ছেলে যদি দুমাসের মধ্যে শর্টহ্যান্ড-টাইপরাইটিং মোটামুটি শিখে নিতে পারে,

তা হলে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বিজয়চাঁদবাবু লোক ভালো, ও'র কথার নড়চড় হয় না!

চাকরি? আমি কলেজে পড়বো না? আমার ষোলো বছর বয়েস, এর মধ্যেই আমি চাকরি করতে যাবো?

রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার সামনে। বাবা তিক্তভাবে বললেন, আমার শরীরের যা অবস্থা, একদিন ধুপ করে পড়বো আর মরবো! কদ্দিন আর এই সংসারের হাল টানবো আমি? এবারে নিজেরা একটা কিছু ব্যবস্থা দেখো! তোমাকে কলেজে পড়াবার সাধ্য আমার নেই!

কলেজে পড়ার ব্যাপারটা আমি এতই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলাম যে এ সম্পর্কে আমার মনে কোনো প্রশ্নই জাগেনি! ইস্কুলের পর তো সবাই কলেজে যায়। কলেজে গিয়ে আনন্দ করবো বলেই তো এত কষ্ট করে ইস্কুলের পড়া শেষ করলাম।

আমি ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, মা আমি কলেজে পড়বো না?

আমার গলার আওয়াজের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা দারুণ হাহাকার ছিল। মা কোনো কথা না বলে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো।

কিন্তু তখন আমি মায়ের দুঃখ বুঝিনি। আমার নিজের ভেতরের ঝঞ্ঝা নিয়েই আমি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। আমি তবু বারবার বলতে লাগলাম, কেন? কেন আমি পড়বো না? আমি চাকরি করবো না! তুমি বাবাকে বলো—

মা উদাসীন ভাবে বললেন, আমার কথা কে শুনবে বল? আমার তো হাঁড়ি ঠেলাই কাজ। আমার কথার কি কোনো দাম আছে এ বাড়িতে?

আমি বললাম, অজয়, শিবনাথ, নন্দকিশোর—আমার সব বন্ধুরা কলেজে পড়বে। আর আমি একা পড়বো না?

মা নিজের হাতের চার গাছা সোনার চুড়ি ছুঁয়ে বললেন, আমার তো আর এই আছে, এই ক'খানা বিক্রি করে কি তোর পড়াশুনো হবে? তোর দিদির বিয়ের জন্য তো সবই গেছে!

তখনও টাকা পয়সার ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকতে চায় না। অজয়দের তো টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই! অজয় যখন যা চায়, তাই পায়—আর আমার টাকার জন্য কলেজে পড়া হবে না?

দিদির ওপর রাগ হলো সবচেয়ে বেশী। দিদি সব সময় সেজে গুজে আদুরে মেয়ে হয়ে থাকতো। আমাদের বাড়ির সব টাকা পয়সা নিয়ে সে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। সেই জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?

রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল, অজয় আর আমি দু'জনেই সেকেণ্ড ডিভিশান পেয়েছি। আগে ইস্কুল জীবনটা শেষ করার জন্য আঁকুপাঁকু করতাম, এখন ইস্কুল জীবন যখন সত্যিই শেষ হয়ে গেল, তখন দেখলাম আমার সামনে জীবনটা শূন্য।

সেদিন অজয় আমাকে ডাকতে এসে বাড়িতে পেল না। আমি একা একা দুর্গাবাড়ির কাছে গিয়ে বসেছিলাম। অজয়ের উপরেও আমার একটা অকারণ অভিমান জন্মে গেছে। অজয় আর আমি তো একই রকম ছেলে, তবু অজয় সব ব্যাপারে আমার থেকে জিতে যাবে। অজয় কলেজে পড়বে, হয়তো একদিন বিলেতেও যাবে, ও মুন্নিকে ভালোবাসবে। আমি কিছুই পাবো না। এমন কি অতনুরও ভাগ্য আমার চেয়ে ভালো। ওর বাবা-মা নেই যদিও কিন্তু অতনু স্কলারশীপ পায়। ফাইন্যালে নিশ্চয়ই ও আরও ভালো রেজাল্ট করবে, বেশী টাকার স্কলারশীপ পাবে, সেই টাকাতে ও পড়বে। আমার বাবা-মা থেকেও বা কী লাভ হলো?

সর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং-এর ইস্কুলে ভর্তি হয়ে আমি কয়েকদিন টাইপ রাইটারে খটাখট্ করতে লাগলাম। ক'দিনেই বুঝতে পারলাম, টাইপিংটা যদিও বা শিখতে পারি, শর্টহ্যাণ্ড আমার দ্বারা

জীবনে হবে না। ঐ আঁকিবুকি কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। বিজয়চাঁদবাবুর চাকুরি আমার জুটবে কিনা সন্দেহ। বাবা প্রায়ই বলতেন, লেখা পড়া না শিখলে আমাকে চায়ের দোকানে বয় হতে হবে। বোধহয় সেইটাই আমার নিয়তি। আমি বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা মুন্নির সঙ্গে আর দেখা করি না।

দেবাশিসদার বিলেত যাওয়া কী কারণে যেন পিছিয়ে গেছে। উনি এলাহাবাদে একটা চাকরি পেয়েছেন। বিয়ের আড়াই মাস পরে দিদি আবার এলো আমাদের বাড়িতে। দিদিকে এখন যেন চেনাই যায় না। তার গা ভর্তি নতুন গয়না, সিঁথিতে নতুন সিঁদুর, নতুন শাড়ী, নতুন চটি। একজন মানুষের শরীরে যদি সব কিছু ঝকঝকে নতুন থাকে, তাকে অন্যরকম দেখাবেই। দিদির মুখ চোখেও একটা ঝলমলে খুশীখুশী ভাব।

সেই ক'দিন আবার আমাদের বাড়িতে খুব জমজমাট খাওয়া দাওয়া হতে লাগলো। বড় বড় মাছ, নানা রকম মিষ্টি আর দামী দামী ফল। মেয়ে-জামাইকে তো খাতির করতেই হবে। এখন এই টাকা আসছে কোথা থেকে? মায়ের হাতের আরও দুগাছা চুড়ি বিক্রি হয়েছে নাকি?

দুপুরের দিকে দিদি পাড়া-বেড়াতে যায়। চেনা শুনোদের বাড়িতে দিদির নেমন্তন্ন থাকে প্রায়ই। সেইসব জায়গায় যাবার সময় মা দিদিকে গা ভর্তি গয়না পরিয়ে দেন। সবাইকে দেখাতে হবে তো! দিদির প্রাক্তন দুই প্রেমিককে আর কোথাও দেখা যায় না এই সময়, তারা মনের দুঃখে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে। দারুণ সেজেগুজে হাসি মুখে দিদি যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন দূর থেকে দেখে এক এক সময় আমারই মনে হয়, দিদি যেন অন্য কেউ হয়ে গেছে, আমাদের কেউ নয়।

তিনদিন বাদে দুপুরবেলা দিদির মুখোমুখি পড়ে গেলাম সিঁড়িতে। আমি চুপি চুপি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। দিদি আমার হাত

চেপে ধরে বললো, এই বাপ্পা, তুই ক'দিন ধরে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন রে? আমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাই বলিস না!

আমি মুখ গোঁজ করে বললাম, ছাড়ো! আমার কাজ আছে!

—এই দুপুর রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিস?

—বললাম তো, আমার কাজ আছে।

—ইস্ ভারী ওর কাজ। আয়, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

—পরে কথা বলবো, এখন বেরুচ্ছি দেখছো না।

দিদি আমার হাত ছেড়ে দিল কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো পথ আটকে আমাকে ভালো করে দেখে আবার বললো, এই ক'দিনেই তুই অনেক বড়ো হয়ে গেছিস! তুই কলেজে ভর্তি হলি না কেন?

—আমার ইচ্ছে।

—এ আবার কী কথা? তুই আর পড়বি না? পুরুষ মানুষ মুখ্যু হয়ে থাকবি?

—কী হবে পড়াশুনো করে। আমি চাকরি খুঁজছি।

—তুই এইটুকু ছেলে, কোথায় চাকরি করবি?

—চায়ের দোকানে আমার চেয়েও ছোট ছেলেরা চাকরি করে।

সেদিন রাত্তিরে খেতে বসে দিদি হঠাৎ বলে উঠলো, মা, বাপ্পাকে আমাদের সঙ্গে এলাহাবাদে নিয়ে যাবো ভাবছি। আমারা যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি, সেটাতে দুখানা ঘর—এমনিই খালি পড়ে থাকে, বাপ্পা আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মা বাবার দিকে শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে বললেন, ঘুরে আসুক কিছুদিনের জন্য না হয়।

বাবা বললেন, ও তো এখানে টাইপিং স্কুলে ভর্তি হয়েছে, হঠাৎ যদি আবার বাদ পড়ে যায়—

দিদি বললে, ওসব টাইপিং মাইপিং শিখে কী হবে? বাপ্পা কি কেরানি হবে নাকি?

বাবা বললেন, কেরানির ছেলে কেরানি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

দেবাশিসদা মুখ নীচু করে গম্ভীর ভাবে খাচ্ছিলেন, এইবার মুখ তুলে বললেন, আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই কলেজ, বাপ্পা সেখানে পড়তে পারে। খুব নাম করা কলেজ।

আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। কলেজ! আমার সেই স্বপ্ন! দিদি সত্যিই আমাকে কলেজে পড়াতে চায়? দিদিটা তো দারুণ স্বার্থপর। বিয়ের পর এতখানি বদলে গেছে?

বাবা বললেন, ওর পড়াশুনোয় তেমন মাথা নেই! দ্যাখো না, সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছে, এর পর কী আর কোনো লাইনে চান্স পাবে?

দেবাশিসদা বললেন, স্কুল ফাইনালে আমারও রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। পরে ঠিক মেক আপ করে নেওয়া যায়!

দিদি বললো, এখানে তো বাপ্পার হাজারটা বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা দিয়েই সময় কাটিয়েছে, তাই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি! ওখানে একা থাকবে, মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারবে।

মা বললেন, তোরা তো এলাহাবাদে কতদিন থাকবি কিছু ঠিক নেই! হঠাৎ যদি বিলেত চলে যাস্—

দেবাশিসদা বললেন, নাঃ, আমি আর বিলেত যাবোই না ঠিক করেছি। পরে হয়তো এই অফিস থেকেই একবার পাঠাতে পারে। তখন দেখা যাবে—নিজে গরজ করে আর আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

বাবা সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বিলেত যাবে না কেন? একটা হায়ার ট্রেনিং-এর সুযোগ পেলে—

দেবাশিসদা বললেন, বিলিতি ডিগ্রির আর তেমন দাম নেই এদেশে। তাছাড়া যেদিন শুনলাম, একটা টিউব স্টেসনে দু'জন ভারতীয় ছাত্রকে অপমান করেছে ও দেশের ছেলেরা। পুলিশকে

জানানো সত্বেও পুলিশ কোনো অ্যাকশান নেয়নি, সেদিন থেকে বিলেত সম্পর্কে আমার ভক্তি চটে গেছে।

কিছুক্ষণ বিলেতের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা চললো। আমার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। আমি ছটফট করতে লাগলুম। আমার প্রসঙ্গ আর উঠলোই না। মনে হলো, বাবা আমার যাওয়াটা পছন্দ করছেন না।

সেদিন সারাটা রাত আমার আবার প্রায় নিদ্রাহীন কাটলো। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার বাবার টাকা নেই বলে আমার কলেজে পড়া হবে না! আমার বন্ধুরা কলেজে যাবে, আর আমি চাকরি খুঁজবো! আমার এখন দুটো মাত্র জামা, তাও একটা ছিঁড়ে গেছে, নতুন জামা কিনে দেবার কথা বাড়িতে কেউ বলে না। বাবার দিন দিন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এখন তো আমার চাকরি করাই উচিত। আমি তো মন ঠিক করেই ফেলেছিলাম। দিদি আর দেবাশিসদা কেন যে আমায় লোভ দেখালো। দিদি কি বাবাকে বোঝাতে পারবে? পারবে না। দিদি শুধু একটা কথার কথা বলেছে!

অতনু ঘুমিয়ে থাকে আমার পাশে। অতনু অনেক রাত জেগে পড়ে তারপর মড়ার মতন ঘুমোয়। একবার ভাবলাম ওকে ডেকে তুলি। কিন্তু ডাকলাম না। ইস, আমি যদি ওর মতন মন দিয়ে পড়ে আর একটু ভালো রেজাল্ট করতাম।

পরদিন, সকালে দিদি বেশ জোর দিয়ে বললো, তুই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিস কিন্তু। বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে।

॥ ৭ ॥

একটা শেকড়শুদ্ধ গাছকে উপড়ে নেবার মতন, আমাকে কাশী থেকে নিয়ে আসা হলো এলাহাবাদে। এর আগে আমি মা-বাবাকে ছেড়ে বেশী দিন কোথাও থাকিনি, তার চেয়েও বড় কথা, বেনারস ছেড়ে আর কোথাও থাকতে আমার ভালো লাগেনি কখনো। বেনারসের প্রতিটি রাস্তা, গঙ্গার ঘাট, আলো-বাতাস—সব যেন আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। তা ছাড়া আমার বন্ধুরা, অজয়, মুন্নি, অতনু—সবাই এখানে থেকে যাবে, শুধু আমাকেই চলে যেতে হবে একা। যেন আমি দূর বিদেশে যাচ্ছি।

অজয় প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিল। ইস্কুলের প্রথম ক্লাস থেকে অজয় আর আমি একসঙ্গে পড়েছি—কলেজেও আমরা একসঙ্গে পড়বো, এই তো ছিল স্বাভাবিক। অজয় এমন চটে গেল যে সোজাসুজি আমার বাবাকে এসে বললো, মেসোমশাই, কেন আপনি বাপ্পাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?

আমার বাবা রাগী ধরণের লোক। আমরা কেউ সোজাসুজি তাঁর সামনে এসে কথা বলার সাহস পাইনি আগে। কিন্তু অজয় এখন অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে।

বাবা বলেছিলেন, আমি তো পাঠাতে চাইনি। ও তো নিজের ইচ্ছেতেই যাচ্ছে। আমি তো ভেবেছিলাম, ও একটা চাকরি নিয়ে সংসারের সাহায্য করবে! কিন্তু তাতো ও করলো না।

অজয় বললো, চাকরি ও নিশ্চয়ই করবে। আমরা সবাই চাকরি করবো। কিন্তু কলেজে পড়া আগে শেষ হয়ে যাক্!

—ওকে কলেজে পড়াবার সামর্থ্য আমার নেই।

—ঠিক আছে, বাপ্পা তা হলে আমাদের বাড়িতে এসে থাকুক। আমারা দুজনে এক সঙ্গে পড়বো।

অজয় এ কথা বলেছিল সত্যিকারের আবেগ থেকে। ও জানে না এটা সম্ভব নয়।

বাবা ওকে উত্তরটা দিয়েছিলেন খুব নিষ্ঠুরভাবে। এতটা নিষ্ঠুর তিনি না হলেও পারতেন।

বাবা বলেছিলেন, বামুনের ছেলে কখনো কারুর বাড়িতে এ রকম আশ্রয় নিয়ে থাকে না। আমাদের বংশে কেউ কখনো থাকেনি। অবশ্য আজকাল দিন পাল্টাচ্ছে, আরও কত কী দেখবো।

অজয় বিবর্ণভাবে চুপ করে গেল। অজয়রা যথেষ্ট বড়লোক, এই শহরে ওদের বেশ প্রতিপত্তি আছে, অনেক বামুনকেই সে ওদের বাড়িতে ভিক্ষে কিংবা নানারকম সাহায্যচাইতে যেতে দেখেছে তবু বামুনদের যেন আলাদা অহংকার আছে। মুন্নিরাও বামুন, তাদের বাড়িতে লোকজন যেন অজয়দের পাত্তাই দেয় না।

আমাকে চলে যেতে হবে শুনে অতনুও আঘাত পেয়েছিল খুব। কিন্তু কোনো কথাই বলেনি। অতনু রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে, আর আমাকেই যেতে হবে বাড়ি ছেড়ে—এটা যে সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার, তা বুঝেও অতনু কিছুই করতে পারলো না। ও নিঃশব্দে সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। এলাহাবাদ পৌঁছে আমি সুটকেস খুলে দেখেছিলাম, জামার ভাঁজের মধ্যে রয়েছে কুড়িটা টাকা। অতনু ওর স্কলারশীপের টাকা কখন গোপনে রেখে দিয়েছে আমার বাক্সে।

আসবার আগে আর মুন্নির সঙ্গে দেখা হলো না। মুন্নিদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম রাস্তায় টাস্তায় মুন্নির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। কিন্তু হলো না। কী একটা কারণে তখন তিন চার দিনের জন্য ইস্কুল বন্ধ ছিল; তার মধ্যেই আমি চলে এলাম।

আসবার সময়, আমাদের সাইকেল রিক্সা যখন মুন্নিদের বাড়ির

পাশ দিয়ে আসছে, আমি সতৃষ্ণভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম যদি জানালায় বা ছাদে ওকে দেখতে পাওয়া যায়। দেখা গেল না।

কেন জানি না, আমার মনে হলো, মনুদির সঙ্গে জীবনে আর কখনো আমার দেখা হবে না। যদিও এলাহাবাদ এমন কিছু দূরে নয়, যখন তখন আসা যায়, তবু যেন আমি কাশীর সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি। নিতান্ত অকারণের অভিমানে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল, কিন্তু রিক্সায় অতনু আমার পাশে বসল। সে যাতে বুঝতে না পারে, তাই আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম অন্য দিকে।

এলাহাবাদে দিদিদের বাড়িটা একটু ফাঁকা মতন জায়গায়। একটু দূরেই কলেজ। কলেজের বাড়িটা তখন নতুন তৈরী হয়েছে। কী ঝকঝকে সুন্দর দেখায়। আমার ঘর থেকেই দেখা যায় কলেজটা।

আমার ঘরটা একতলায়। দিদি আর দেবাশিসদা দোতলায় থাকে। বাইরের কোনো লোক এলে আমিই দরজা খুলে দিই। কিছুদিন আগে এখানে পরপর দুটি বাড়ির বৌ দুপুরবেলা চাকরের হাতে খুন হয়েছে বলে দেবাশিসদা বাড়িতে চাকর রাখেনি। একজন রাঁধুনী আছে, আর একজন ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে ঘর মুছে দিয়ে যায়। আমাকে যে দিদি অনেকটা বাড়ি পাহারা দেবার জন্যই এনেছে তা দু' একদিন বাদেই বুঝতে পারলাম।

সারাদিন দিদির কোনো কাজ থাকে না। দেবাশিসদা সকালে ন'টার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসতে আসতে প্রায় সাতটা বেজে যায়। বাবাঃ চাকরি করতে গেলে এতক্ষণ ধরে খাটতে হয়? দিদিকে আমি একদিন সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

দিদি খানিকটা গর্বের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ তা তো হবেই, ইঞ্জিনিয়ারদের খাটতে হবে না? কতখানি দায়িত্ব! মাস্টার বা কেরানীদের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়—তাদের কতটুকুই বা কাজ!

সেই কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তা হলে আর আমার

ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নেই! এতটা সময় অফিসেই চলে যাবে? তা হলে আর জীবনে করার কিছুই থাকবে না?

দেবাশিসদাকে দেখি, অফিস থেকে ফিরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ও'র অফিসও অনেকটা দূরে। অফিস থেকে ফিরে স্নান টান করে চা খেতে খেতে সাড়ে সাতটা-আটটা বেজে যায়। তারপর দিদিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন একটু। কোনো কোনো দিন নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে যান। কিন্তু বেশী রাত করলে ও'র অসুবিধে হয় পরদিন খুব সকাল সকাল ওঠার ব্যাপার থাকে। দেবাশিসদা আগে কত খেলাধুলো করতেন, ইউনিভার্সিটিতে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে খুব নাম ছিল—এখন সে সবই বন্ধ। প্রত্যেক শনিবার ওঁর অফিসের বন্ধুরা বাড়িতে আসে, খুব হৈ-হল্লা আর তাশ খেলা হয়। তাস খেলা আমার বিচ্ছিরি লাগে।

কলেজে ভর্তি হতে যাবার দিন দেবাশিসদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন সাবজেক্ট নেবে ঠিক করেছো?

আমার আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অজয় সায়েন্স পড়বে, আমিও সায়েন্স। আমার বাবারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু আমি ঝট করে মত বদলে ফেললাম।

আমি বললাম আর্টস। আমি ইংলিশে অনার্স নেবো!

দেবাশিসদা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, সে কি? অনার্স পড়ে কি করবে? ওতে তো কোনো স্কোপই নেই।

আমি তবু বললাম, না, আমি আর্টসই পড়বো! আমার অঙ্কে মাথা নেই।

—আরে ইস্কুলের অঙ্ক আর কলেজের অঙ্ক এক নয়। ' একটু মন দিলেই শিখতে পারবে! অঙ্ক মানে তো কতগুলো নিয়ম. তা ছাড়া আর কি?

আমি তবু বললাল, না। আমি পারবো না!

দেবাশিসদা দিদিকে ডাকলো। দিদিও এসে আমাকে বোঝাবার

চেষ্টা করলো। দিদি বলতে লাগলো, আর্টস পড়ে তো মাস্টার বা কেরানী হতে হবে, জীবনে উন্নতি করতে পারবি না।

আমি মনে মনে বললাম, আমার উন্নতির দরকার নেই।

আসলে, তখনই একটা কথা আমি বুঝে গিয়েছিলাম। অংকে আমি খুব খারাপ ছিলাম না। অংকে আমার নম্বরও ভালো ছিল। ভূগোল আর সংস্কৃতে আর একটু ভালো নম্বর পেলে আমি ফার্স্ট ডিভিশানই পেয়ে যেতাম। কিন্তু সায়েন্স পড়ে আমার কী লাভ হবে? দু'বছর সায়েন্স পড়ার পর আমি যদি ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হই, তখন কে আমার খরচ চালাবে? কত দিন আমি দিদির বাড়িতে আশ্রিত থাকবো?

নিজের বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসেই আমি বুঝতে পেরেছি অন্যের বাড়িতে থাকবার স্বাদ অন্যরকম। কিছুতেই নিজের বাড়ির মতন হয় না। হোক না নিজের দিদি। তা ছাড়া দিদি তো আমায় সে রকম ভালোবাসে না। আমি দিদির একটা মাত্র ভাই, তাও ভালোবাসে না। দিদি অন্য কারুকে ভালোবাসতে জানেই না। শুধু নিজেকে ভালোবাসে।

আমার গোঁয়ার্তুমি দেখে বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত দেবাশিসদা আমাকে আর্টসে ভর্তি করে দিলেন। দিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভালো রেজাল্ট করতে পারলে আর্টসেও অনেক স্কোপ আছে। বাপ্পা যদি রিসার্চ স্কলার হতে পারে—

কলেজে প্রথম দিনের ক্লাস করতে গেলাম অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। কারুকে চিনি না। এলাহাবাদের ছেলেরা কেমন হয় কে জানে! মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম, বেনারসে সেই দিন অজয় আর আমার অন্যান্য সব বন্ধুরা দল বেঁধে এক কলেজে ঢুকছে, সবাই হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে—ইস্কুলের পুরো ব্যাচটাই চলে এসেছে ঐ কলেজে—শুধু আমি এখানে একা। আমার চোখ জ্বালা করে উঠেছিল।

এলাহাবাদের এই কলেজে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। যে তিন চারটি ছাত্র আছে আমাদের সেকশানে, প্রথম দিন তাদের কেউই আমার সঙ্গে নিজের থেকে আলাপ করলো না। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বেনারসের তুলনায় এলাহাবাদের ছেলেদের জামা কাপড়ের চাকচিক্য অনেক বেশী। অধিকাংশ ছেলেই নতুন ধরণের শার্ট-প্যান্ট পরে এসেছে। ওদের পাশে আমার খাঁকি প্যান্ট আর টুইলের সাদা শার্ট পরা চেহারা খুবই মলিন দেখায়।

কলেজ ছুটির পরই একটা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে বাড়ি চলে আসি। যদি কোনো চিঠি থাকে। অবশ্য রোজ রোজ আর কে চিঠি লিখবে আমাকে। অতনুই বেশী চিঠি লেখে প্রায় একদিন অন্তর একদিন। সুন্দর চিঠি লেখে অতনু, ওর হাতের লেখাও মুক্তোর মতন ঝকঝকে।

অজয় বেশী চিঠি লেখে না। ওর চিঠি লেখার অভ্যেস নেই। যাও লেখে, তাও খুব ছোটো। প্রথম চিঠিতেই অজয় লিখেছিল, বেনারসে কলেজে পড়তে ওর একটুও ভালো লাগছে না, ওরও ইচ্ছে এলাহাবাদে পড়তে আসবে। ওর বাবাকে সে কথা বলেছে; ওর বাবা হ্যাঁ-ও বলছেন না, না-ও বলছেন না। এলাহাবাদে থেকে ওর পড়াশুনো করবার কোনোই অসুবিধে নেই, কারণ এখানে ওর মামা বাড়ি। ওকে পেলে ওর মামারা খুব খুশী হবে।

সেই চিঠি পেয়ে আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। অজয় সত্যি এলে দারুণ হয়। কিন্তু তৃতীয় চিঠিতেই অজয় লিখলো, ওখানকার কলেজের স্পোর্টস ক্লাবে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়েছে। যাঃ! তা হলে আর অজয় আসবে কেন?

অজয় কিংবা অতনু কারুর চিঠিতেই মুন্নির কোনো উল্লেখ নেই। ওদের সঙ্গে কি মুন্নির দেখা হয় না? তা হলে আমায় সে কথা জানায় না কেন? আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল,

মুন্নি নিজেই হয়তো আমাকে একটা চিঠি লিখবে। মুন্নি কি জানে না যে আমি চলে এসেছি? আমার কথা ওর একটুও মনে পড়ে না? আমার ঠিকানা তো ও অজয়দের কাছ থেকেই জেনে নিতে পারে।

আমারও ইচ্ছে করে মুন্নিকে চিঠি লিখতে। কিন্তু ভয় হয়। ওর বাড়ির লোক সকলেই দারুণ রাগী। যদি আমার চিঠি দেখে রেগে যায়?

মুন্নিকে চিঠি লেখার বদলে আমি ডাইরি লিখতে সুরু করলাম।

অতনু যে কুড়িটা টাকা আমাকে দিয়েছিল, তা প্রথম কয়েক-দিনেই দুম করে খরচ হয়ে গেল। খরচের সময় হিসেব করিনি। এতদিন পর্যন্ত আমার নিজস্ব কোনো ফাউণ্টেন পেন ছিল না, এখানে এসে মনে হলো, কলেজের ছাত্রের পকেটে একটা পেন না থাকলে মানায় না। কিনে ফেললাম সাত টাকা দিয়ে একটা ফুলদানি। দেবাশিসদাকে চন্দন কাঠের বোতামের একটা সেট উপহার দিলাম। দিদিকে মাথার চুলের জাল। নিজের জন্য একটা মানি ব্যাগ। কয়েকদিন পরই দেখলাম, আমার পকেটে ব্যাগ আছে বটে, কিন্তু শূন্য।

দেবাশিসদা বলে রেখেছিলেন, দিদির কাছে চাইলেই আমি প্রত্যেকদিন আট আনা করে হাত খরচ পাবো। কিন্তু দিদিটা এমন কৃপণ কিছুতেই সেটা পাওয়া যায় না। চাইলেই বলে, খুচরো নেই, পরে নিবি।

বেশী পেড়াপিড়ি করলে দিদি অমনি ধমক দেয়। চোখ রাঙিয়ে বলে, কেন, অত পয়সার দরকার কিসের জন্য রে! কাছেই কলেজ —বাস ভাড়া লাগে না, টিফিনের সময় দৌড়ে এসে বাড়িতেই খেয়ে যেতে পারিস—তবু পয়সা লাগবে কি জন্য?

আমি যদি বলি, কাগজ কিনবো কিংবা খাম পোস্টকার্ড কিনবো —তাতেও পার পাবার উপায় নেই। দেবাশিসদা অফিস থেকে বড় বড় সাদা প্যাড আনে—সুতরাং কাগজের কোনো অভাব নেই। খাম-পোস্টকার্ডও দিদির কাছে কেনা থাকে।

দিদি বলে পয়সা নিয়ে নিশ্চয়ই সিগারেট খাবি?

—না তো। আমি সিগারেট খাই না।

—খাস না? আমার বিয়ের দিন খাসনি? আমি ঠিক গন্ধ পেয়েছিলাম।

আমি মুখ শুকনো করে বললাম, আমি নয়, অজয়।

—ফের মিথ্যে কথা? আয় এদিকে আয়—

দিদি ছাড়ে না। কাছে ডেকে আমার হাত দুটো নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখে তবুও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

—ছোট ছেলেদের হাতে পয়সা দেওয়া মোটেই উচিত নয়। অনেক আজে বাজে অভ্যেস হয়ে যায়।

—ছোট ছেলে? দিদি আমি ছোট ছেলে? কলেজে পড়ি।

—যাঃ যাঃ।

দিদি একটা জিনিস বোঝে না, পুরুষ মানুষের ব্যাপারটা সে রকম কোনো দরকার না থাকলেও পকেটে একটাও পয়সা না থাকলে মনটা ভালো লাগে না। খালি মানি ব্যাগ কেউ পকেটে নিয়ে ঘোরে? বাড়িতে এসে টিফিন খাওয়া যায়—কিন্তু কলেজের অন্য ছেলেরা যখন চিনেবাদাম কেনে, আমারও কি কিনতে ইচ্ছে করে না?

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। দিদি আর দেবাশিসদা বৃষ্টির মধ্যেই নেমন্তন্ন খেতে বেরিয়ে গেল। রাঁধুনি খুব সকাল সকাল আমাকে খেতে দিয়েই নিজে চলে গেল ঘুমোতে। ও বড্ড ঘুমোতে ভালোবাসে। রাঁধতে রাঁধতেও এক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

খেয়ে উঠে আমি পড়ার বই নিয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি ঘুমোলে চলবেনা—দিদিরা ফিরলে দরজা খুলে দিতে হবে।

দেবাশিসদার অফিসের ম্যানেজারের বাড়িতে নেমন্তন্ন, ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে। গেছে সেই সিভিল লাইনসের কাছে, এখান থেকে অনেক দূর।

বাইরে বৃষ্টি পড়ার ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ হচ্ছে। আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে বাইরেটা ঝলসে উঠছে—একটু বাদেই আমার ঘুম এসে গেল। খেয়ে উঠে আর কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করে না। সেদিন আবার কলেজের কমন রুমে অনেকক্ষণ ধরে পিং পিং খেলেছিলাম। কোমরের কাছে ব্যথা হয়ে আছে।

না, ঘুমোলে চলবে না তো! দিদিরা ফিরে এসে যদি দেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, খুব ঠাট্টা করবে। হঠাং একটা কথা মনে পড়লো। একটা সিগারেট খেলে ঘুম চলে যেত। আমি এখানে এসে একদিনও সিগারেট খাইনি। আমার ভালো লাগে না। অজয় মাঝে মাঝে খায়। অজয় বলেছিল, পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়তে পড়তে ও দু একটা করে সিগারেট খেয়েছে, তাতে ঘুম কেটে গেছে।

দিবাশিসদায় আলমারিতে সিগারেট আছে। দেবাশিসদা এক সঙ্গে অনেক সিগারেট কিনে রাখে। তার মধ্য থেকে একটা নিলে বুঝতে পারবে না।

ওপর তলায় গেলাম সিগারেট খুঁজতে। টানা বারান্দাটা দিয়ে একা একা যেতে কি রকম গা ছমছম করে। পাশেই মাঠ। এলোমেলো কয়েকটা গাছ অন্ধকারে ভিজছে মাঠের ওপাশে একটা কবরখানা। সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না আমার এই সময়।

নিচে ফিরে এসে সিগারেটটা ধরিয়ে আমি শেষও করতে পারলাম না, তার আগেই আমার ঘুম পেয়ে গেল! কে বলেছে, সিগারেট দিয়ে ঘুম তাড়ানো যায়? যত বাজে কথা। চেয়ারের

ওপর বসে বসেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জলন্ত সিগারেটটাআমার হাত থেকে খসে পড়লো টেবিলের ওপর। সেখানেই ধোঁয়াতে লাগলো। একটা কিছু অগ্নিকাণ্ড হয়ে যেত আর একটু হলে!

একটা টক্‌টক্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই চোখ পড়লো জলন্ত সিগারেটটার ওপর। তাড়াতাড়ি সেটা তুলেই নিভিয়ে দিলাম। ইস, টেবিলের ওপর একটু পোড়া লেগে দাগ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই দিদির চোখে পড়বে।

কিন্তু কিসের শব্দ হলো। এদিক ওদিক তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। গায়ে একটা শিহরন বয়ে গেল। আবার টক্‌টক্ শব্দ। এবার রাস্তার দিকের জানলায়। জানলার কাচ বন্ধ। তার বাইরে যেন কার মুখ! জলে ভেজা চুল, বড় বড় চোখ একটি মেয়ে......

আমার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি। এখনো জেগে উঠিনি। ভালো করে চোখ রগড়ালাম। কে যেন ফিসফিস করে আমার নাম ধরে ডাকছে।

তারপর একটা ফর্সা হাত জানলার জলে ভেজা কাচটা ঘসে ঘসে পরিষ্কার করলো। মুখটা এবার স্পষ্ট দেখা গেল অনেকখানি।

আমি সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠলাম। মুন্নি! সত্যিই তো মুন্নি! এলাহাবাদে এত রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে জানলার বাইরে মুন্নি।

॥ ৮ ॥

আমি ছুটে গেলাম দরজা খোলার জন্য। এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, হুড়োহুড়িতেই দরজার ছিটকিনিটাই খুলতে পারলুমে না কিছুক্ষণ! মনে হলো যেন অসম্ভব আঁট হয়ে গেছে। আসলে আমি ছিটকিনিটা নীচে নামিয়েও চেপে ধরেছিলাম। খেয়াল করিনি যে দরজাটা ততক্ষণ খুলে গেছে।

দরজা ঠেলে ঢুকলো মুন্নি বিস্ময়ে এবং এক ধরনের ভয়ে আমার চোখ দুটি বিস্ফারিত, কিন্তু মুন্নি হাসছে।

কিরে মুন্নি, তুই? কার সঙ্গে এলি?

মুন্নি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো. চুপ! চ্যাঁচাসনি, কেউ শুনতে পাবে।

—কেন, কী হয়েছে?

—আস্তে কথা বল না। যদি কেউ শুনে ফেলে?

এবার মুন্নি দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে বললো, একদম ভিজে গেছি! একটা তোয়ালে দে না।

—কোথা থেকে এসেছিস? কার সঙ্গে এসেছিস?

—কারুর সঙ্গে না।

—একা?

—তুই তোয়ালে দিবি না?

বসবার ঘরের পাশের ঘরটাই আমার। মুন্নিকে টানতে টানতে সেখানে নিয়ে এলাম। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বাজে। দিদিদের ফিরতে নিশ্চয়ই আর একটু দেরি আছে।

আমার তোয়ালে নেই, গামছা। বাইরের দড়িতে সেটা ঝুলছিল। মুন্নি গামছা দিয়ে মাথা মুছতে লাগলো। কিন্তু তার শাড়ি সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। এই ভিজে শাড়ি পরে ও কতক্ষণ থাকবে

মুন্নি তুই এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে কোথা থেকে এলি? কার সঙ্গে এসেছিস? এ সব কিছু বলছিস না কেন?

মুন্নি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুভাবে হাসলো। তারপর আর কোনো কথা না বলে একমনে মাথার চুল মুছতে লাগলো। এক সময় মুন্নির চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা ছিল, এখন চুল বেশ লম্বা হয়েছে, প্রায় কোমর সমান।

মুন্নি গামছাটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আমি কি এই ভিজে শাড়ি পরে থাকবো? একটা কিছু দিবি না?

দোতলায় দিদির শাড়ি আছে। দিদি বাইরে যাবার সময় নিজের ঘর তালা-বন্ধ করে যায়। বাইরে বোধহয় দু' একটা শাড়ি পাওয়া যেতে পারে।

বললাম, তুই এখানে বোস। আমি দিদির একটা শাড়ি নিয়ে আসছি।

মুন্নি আমার হাত ধরে টেনে বললো, না, তার দরকার নেই। তা হলে ধরা পড়ে যাবো।

—ধরা পড়ে যাবি মানে? তুই কি লুকিয়ে থাকতে চাস নাকি?

—হ্যাঁ। বাপ্পা, তুই আমাকে একটা রাত লুকিয়ে রাখতে পারবি না?

—তার মানে? কী ব্যাপার হয়েছে, খুলে বল্ তো?

—বলছি। তোর শুকনো পাজামা নেই? আর পাঞ্জাবী? তাই দে না, আমি শাড়িটা ছেড়ে ফেলি।

আমার সুটকেস খুলে একটা কাচা পাজামা পাওয়া গেল, কিন্তু পাঞ্জাবী নেই, আমি তো পাঞ্জাবী পরি না। শার্ট আছে। সেই একটা শার্ট আর পাজামা নিয়ে মুন্নি বাথরুমে চলে গেল।

আমি সেই সময়টুকু বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। বুকের মধ্যে তখনো দুপ্ দুপ্ করছে। মুন্নির এ রকম হঠাৎ চলে আসার কোনো মানেই বুঝতে পারছি না। মুন্নির বাড়ির লোকেরা

খুব কড়া। তারা মুন্নিকে একা একা আসতে দিল? মুন্নি হঠাৎ এরকমভাবে আমার কাছে আসবেই বা কেন?

বাথরুম থেকে যখন মুন্নি বেরিয়ে এলো তখন ওকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। পাজামা আর শার্ট পরা। মাথার ভিজে লম্বা চুল বুকের ওপর ঝুলছে। ওকে অনেকটা ছেলেদের মতন দেখাচ্ছে, অথচ ঠিক ছেলেদের মতনও নয়।

মুন্নি জিজ্ঞেস করলো। বাপ্পা, তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—এই রে! আমার যে খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার নেই?

—দাঁড়া দেখছি।

একতালাতেই ভাঁড়ার ঘর। মুড়ির টিনটা কোথায় থাকে আমি জানি। সে ঘরে গিয়ে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম। দুটো কলাও পাওয়া গেল। আর কিছু বিস্কুট।

সেগুলো নিয়ে ফিরে এলাম। মুন্নি যথার্থ ক্ষুধার্তের মতন বিস্কুটগুলো খেতে লাগলো। তারই মাঝখানে একবার বললো, আমি শুধু একটা রাত্তির থাকবো, কাল সকালেই চলে যাবো কলকাতায়।

আমি উঠে গিয়ে মুন্নির চুলের মুঠি ধরে বললাম, তোর কী হয়েছে, সত্যি করে বল্ তো? কেন আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছিস তখন থেকে?

মুন্নি বললো, ছাড়্, ছাড়্, লাগছে। বলছি, বলছি, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছি।

—একা?

মুন্নি একটু ইতস্তত করলো। কিছু বলতে গিয়েও যেন সেটাকে গোপন করে অন্যভাবে বললো, একা নয় তো কি? আর কেউ সঙ্গে থাকলে তো দেখতেই পেতিস।

আমি মুন্নির চুলের মুঠি ছেড়ে দিলাম। মুন্নির চোখ দিয়ে জল

গড়াচ্ছে। সত্যিই কি আমি বেশী জোরে চুল টেনে ফেলেছি? কিন্তু ব্যথা পেলেও তো মুন্নি চট করে কাঁদে না।

—মুন্নি, তুই কেন এরকমভাবে বাড়ি থেকে চলে এলি? এখন তুই বড় হয়েছিস, ক্লাস টেনে উঠবি, এখনো তোর বুদ্ধি হলো না? এইভাবে কেউ বাড়ি থেকে চলে আসে? এখন তোর বাড়ির লোক টের পেলে?

মুন্নি চোখ দুটো বুজে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। কাঁপা গলায় বললো, আমি এখানে এসেছি তুই রাগ করেছিস। আমি মরে গেলে তুই খুশী হতিস?

—কেন, মরবি কেন?

—আমি একবার ভেবেছিলাম রেললাইনে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

—ছিঃ মুন্নি, এ সব কী কথা?

—তারপর আমি ভাবলাম, না, আগেই মরবো কেন? বাপ্পার কাছে যাই। বাপ্পা রাগ করবে না। বাপ্পা আমাকে থাকতে দেবে। বেনারসের বাইরে আমি তো কারুকে চিনি না।

—তুই বাড়ি থেকে চলে এলি কেন?

—ও বাড়িতে আর আমি কোনোদিন যাবো না। কোনোদিন না—

—কেন, তোকে মেরেছে?

—মারলেও ক্ষতি ছিল না। মারুক না কত মারবে। কিন্তু ওরা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। একদম ঠিক। আজকে আমায় দেখতে আসবার কথা ছিল। এক গাদা লোক—আমি বিয়ে করবো না কিছুতেই না—

—অজয়কে বলেছিলি?

—অজয় আবার কি করবে?

—অজয় যদি বরের বাড়িরা লোকদের ভয় দেখিয়ে দিত!

—অজয় আবার কি করে ভয় দেখাবে ? আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা—সে নিজেই তো একটা গুন্ডা ।

—কিন্তু তোর এখনো ইস্কুলের পরীক্ষা শেষ হলো না । এর মধ্যেই তোর বিয়ে ঠিক করেছিল কেন ?

—তুই আমাদের বাড়ির লোকদের চিনিস না ?

আমি পুরোটা না চিনলেও কিছুটা জানি । ওদের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার । ওদের বাড়িতে মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শেখে না, তের-চোদ্দো বছর বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যায় । মুন্নির বাবা অজয়কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেননি, কারণ অজয়রা ব্রাহ্মণ নয় । আমরা দু'চক্ষে দেখতে পারি না ওদের । এই রকম একটা বাড়িতে মুন্নির মতন একটা মেয়ে জন্মালো কি করে ?

কিন্তু মুন্নির বাবা যদি মুন্নির বিয়ে দিতে চায়, সেটা আটকাবার কোনো ক্ষমতা আমার আছে কি ? ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করলাম । যেন আমার আরও অনেক শক্তি থাকার কথা ছিল, আমি একটা বিশাল শরীর নিয়ে মুন্নির বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতাম সবধান !

জামার হাতায় মুন্নি চোখের জল মুছলো । তারপর বললো, তোর দিদি-জামাইবাবু কখন আসবে রে ?

—এই তো আর একটু বাদেই—

—তোর দিদি আমাকে এখানে দেখতে পেলে খুব রেগে যাবে, না রে ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না । আমার যে কোনো ব্যাপারেই তো দিদি রাগ করে । কিন্তু মুন্নিকে তো দিদি আগে ভালই বাসতো মনে হয় । মুন্নির এই বিপদের সময় দিদি সাহায্য করবে না ? কি জানি, ঠিক নিশ্চিত হতে পারি না ।

মুন্নি আমার নীরবতা দেখেই কিছু একটা বুঝল । তারপর বললো, সে কথা আমি আগেই ভেবেছি । দিদিকে কিছু

বলবার দরকার নেই । আমি লুকিয়ে থাকবো । একটা রাত তো মোটে !

—কী করে লুকিয়ে থাকবি এখানে ।

—কেন তোর দিদিরা যখন ফিরবে, তখন আমি খাটের নীচে ঢুকে পড়বো । টের পাবে কী করে ?

—ধ্যাৎ, তা কখনো হয় নাকি ?

—কেন, হয় না ?

—সেই যে চুনারে গিয়েছিলাম আমরা—ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল, সেবার কী মার খেয়েছিলাম তোর জন্য । কোনো ছেলে আর মেয়ে রাত্তিরবেলা এক ঘরে থাকে না ।

মুন্নি হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, কেন এতে দোষটা কী আছে ? তুই আর আমি আলাদা ? আমরা এক সঙ্গে খেলা করতে পারি, এক সঙ্গে বই পড়তে পারি—আর এক ঘরে ঘুমোলেই যত দোষ ? এই যে আমি তোর জামা কাপড় পরেছি, এতে কি কোন দোষ হয়েছে ?

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, কাল ভোরবেলা তোকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বার করে দিতে পারি । কিন্তু কাল সকালে তুই কোথায় যাবি ?

—কলকাতায় !

—কলকাতায় ? সেখানে কে আছে ?

—কেউ নেই । কিন্তু কলকাতা কত বড় জায়গা, সেখানে কত রকমের মানুষ, সেখানে আমার ঠিক একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।

—কত সোজা ! কলকাতায় পথে ঘাটে চোর ডাকাত ঘুরে বেড়ায় ।

—তা হোক, তবু আমি যাবো । আমি সোজা কলকাতাতেই চলে যেতাম—আমার কাছে পঁচিশটা টাকা জমানো ছিল—টিকিট কাটতাম কিন্তু স্টেশনে এসে আমার একটু ভয় করলো—তাই আমি

তোর কাছে চলে এলাম। হয়তো তোর সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। আমি জানি কলকাতায় গেলে আমার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে—আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম, কলকাতার একটা চারতলা বাড়িতে আমি থাকি, বাড়ির পেছনেই একটা পুকুর—সেখানে আমি আরও অনেকের সঙ্গে সাঁতার কাটছি—সে বাড়ির সব লোক খুব ফর্সা……

—তুই তো কলকাতায় কখনো যাসনি, না?

—না।

—আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। কত উত্তেজনা, কত স্বপ্ন ছিল। ছেলেবেলা থেকে কলকাতার গল্প শুনে শুনে কলকাতাই ছিল আমাদের কাছে স্বর্গ। সেখানে সবাই বাংলায় কথা বলে সেখানে সকাল বিকেলে রাস্তা ধোওয়া হয়, কেউ খালি পায়ে হাঁটে না। কিন্তু বাবার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে ওপার যাওয়ার পরই শহরটাকে দেখে আমার ভয় ভয় করেছিল। বিশাল শহরটা যেন যে-কোনো লোকের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হাওড়া স্টেশনে আমরা একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসেছিলাম। বাবার সঙ্গে ট্যাক্সিওয়ালার কী নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হলো, অমনি ট্যাক্সিওয়ালা জোর করে আমাদের সবাইকে নামিয়ে দিল এমন কি গালাগাল দিতে লাগলো পর্যন্ত। তারপর কলকাতা সম্পর্কে আমার আরও অনেক স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে।

মুন্নি মাত্র পঁচিশ টাকা নিয়ে কলকাতায় গিয়ে কী করবে? ওখানে তো কারুর কোনো দয়া মায়া নেই!

—মুন্নি, তোর কলকাতায় যাওয়া হবে না!

—হ্যাঁ, আমি যাবোই।

এই সময় দরজায় বেল বেজে উঠলো। মুন্নি তড়াক করে খাট থেকে নেমে ঢুকে পড়লো নীচে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত আসতেই দিদিরা খানিকটা ভিজে গেছে।

দিদি ঝংকার দিয়ে বললো, দরজা খুলতে এত দেরি করলি কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?

পাছে আমার গলার আওয়াজে কোনো উত্তেজনা ধরা পড়ে তাই আমি কিছু বললাম না।

দিদির নাক কী সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ। দুবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়েই বললো, তুই আজ সিগারেট খেয়েচিস?

সেই কতক্ষণ আগে একটা সিগারেট খেয়েছিলাম, দিদি তাও গন্ধ পেয়ে গেছে। ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ, সেইজন্য বোধহয় ধোঁয়া রয়ে গিয়েছিল।

দেবাশিসদা সহাস্যে বললো, খেয়েছে তাতে কী হয়েছে?

দিদি বললো, এত করে বারণ করি হাতে একটাও পয়সা দিই না, তবু শ্রীমান সিগারেটখোর হয়েছেন! একদম পছন্দ করি না এ সব!

দেবাশিসদা বললো, আমিও তো খাই। ও খেলে দোষটা কি?

—না। ও যখন চাকরি করবে, তখন না হয় নিজের পয়সায় খাবে। এখন থেকে এ সব বাজে অভ্যেস করা মোটেই উচিত নয়। সিগারেট কোথায় লুকিয়ে রাখা হয় শুনি?

আমি চুপ।

—তোর ঘর তো আমি মাঝে মাঝে খুঁজে দেখি। কোথায় লুকিয়ে রাখিস? আর কটা আছে, বার করে দে!

আমি কোনোক্রমে বললাম, আর নেই।

—চল তো দেখবো।

আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এ কখনো হয়? দিদি কোনোদিন রাত্তিরে আমার ঘরে ঢুকতে চায় না, আর আজই। একেই কি বলে নিয়তি? খাটের নিচে মুন্নিকে চট করে দেখতে না

পেলেও, মুন্নির ভিজে শাড়িটা আমার বাথরুমে ঝুলছে—দিদি কি সেখানে উঁকি মারবে না ?

দেবাশিসদা দিদির পিঠে হাত দিয়ে বললো, আরে কী করছো কি? চলো, ওপরে চলো—। সদর দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিও বাপ্পা।

শীতের মধ্যেও আমার গা দিয়ে বিজ বিজ করে ঘাম বেরিয়ে এলো। দিদিরা ওপরে চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ আমি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দোতলায় দিদিদের ঘর থেকে একটা আলোর রেশ এসে পড়ে উঠোনে—একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে।

এক সময় আলোটা নিভে গেল। তখন আমি খুব সন্তর্পণে নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম। মেঝেতে বসে পড়ে ফিস-ফিস করে মুন্নিকে ডাকলাম, আয় বেরিয়ে আয়!

খাটের নীচে অনেক দিনের ধুলো। তার মধ্যেই পাশ ফিরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে মুন্নি। চোখ দুটি বোজা। আশ্চর্য, এত উদ্বেগ, এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও মুন্নি ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি ওর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললাম, এই মুন্নি, মুন্নি, উঠে আয়।

॥ ৯ ॥

মুন্নি চোখ মেলে এমন ভাবে তাকালো, যেন ও ভুলে গেছে যে কোথায় আছে। তারপর ও ধড়মড় করে উঠে বসতেই খাটের নীচে মাথা ঠুকে গেল।

আমি ওর হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলাম।

গায়ে লেগেছে মাকড়সার জাল সেগুলো মুছে দিয়ে আমি বললাম, তুই আমার বিছানায় শুয়ে পড়। একটা মাদুর আছে সেটা পেতে আমি নীচে শোব এখন।

মুন্নি বললো, এই বিছানাটায় তো অনেক জায়গা আছে। এখানে তো দুজনেই শুতে পারি।

মুন্নি এমন ভাবে বললো কথাটা যেন, এর মধ্যে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। তবু আমি দ্বিধা করতে লাগলাম।

মুন্নি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তোর দিদি-জামাইবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কিছু টের পায়নি তো ?

—না।

—আয় আমরাও শুয়ে পড়ি। ঘুমোবো না কিন্তু, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে তো!

ও বিছানায় উঠে পড়লো। আমার বালিশ একটাই। মুন্নি বললো, তুই বালিস নে, আমার লাগবে না।

আমি বালিশটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, তুই নে। আমার একদিন বালিশ না হলেও চলবে।

—বলছি তো আমার লাগবে না!

—না লাগলেও তোকে নিতে হবে।

—এই, তুই অত জোরে কথা বলছিস কেন ? আচ্ছা বাবা, এই বালিশটাতেই দুজনে মাথা দিয়ে শুচ্ছি। তুই এক পাশে আমি এক পাশে।

দুজনে সেইভাবে শুলাম। কিছুক্ষণ চপচাপ।

তারপর মুন্নি বললো, তুই বুঝি আলো জেলে রাখিস সারা রাত ?

—না। আলো নিভিয়ে দেবো ? নিভিয়ে দেওয়াই বোধহয় ভালো, যদি দিদি হঠাৎ একবার উঠে পড়ে আমার ঘরে আলো দেখে—

খাট থেকে নেমে আবার আলো নেভাতে হলো। অন্ধকারে ফের খাটে উঠে আসতেই মুন্নি আমার একটা হাত চেপে ধরলো। খুব

দুখীর মতন গলায় বললো, কাল থেকে আমার আর কেউ থাকবে না, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু, কেউ থাকবে না।

—মুন্নি, তুই সত্যিই কলকাতায় চলে যাবি?

—আমি কিছুতেই আর বাড়ি ফিরে যাবো না। যদি মরেও যাই তাও ফিরবো না।

—তোর মামারা বাড়ি তো কানপুরে। সেখানে যেতে পারিস না?

—দাদু বেঁচে থাকলে যেতাম। আমার মামা আমাকে থাকতে দেবে না, ঠিক আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে বাড়িতে। কলকাতাই ভালো, কলকাতায় সব রকম লোক জায়গা পেয়ে যায়, আর আমি পাবো না? কলকাতার ট্রেন কখন ছাড়ে এখান থেকে জানিস?

—না তো।

—কাল খুব ভোরে আমি স্টেশনে চলে যাবো। তারপর যখনই ট্রেন আসুক, উঠে পড়বো। বাপ্পা, তুই যাবি আমার সঙ্গে?

—আমি?

—তোর কাছে টিকিট কাটার টাকা নেই বুঝি? না থাকলেই বা, তুই তো ছেলে টিকিট না কেটেই উঠে পড়বি। যদি ধরা পড়িস না হয় ক'দিন জেল খাটবি।

—তা হয় না রে।

—কেন তোর পড়াশুনো নষ্ট হবে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ শব্দ হচ্ছে এত জোরে, যেন মুন্নিটাও তা শুনতে পেয়ে যাবে।

মুন্নির সঙ্গে আমি এই রাত্রেই যেখানে খুশী চলে যেতে পারতাম। গুলি মেরে দিতাম পড়াশুনায়। তা আমি যেতে পারি না শুধু একটি মাত্র কারণে। অজয় বলেছিল, মুন্নিকে ও ভালোবাসে। আমি আমার কোনো কথা মুন্নিকে বলার আগেই অজয় ঐ

কথাটা মুন্নিকে বলে দিয়েছে। অজয় আমার বন্ধু, আমি তাকে বিট্রে করতে পারি না।

অজয় নিজেই আমাকে এক সময় বলেছিল, ও মুন্নিকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে। এখন অজয়ের বদলে যদি আমি পালিয়ে যাই, সেটা খুব খারাপ দেখাবে না?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুন্নি তুই চলে আসার আগে অজয়কে কিছু বলিসনি?

—কেন, ওকে বলে কি হবে?

—ও নিশ্চয়ই তোকে সাহায্য করতো।

—কী সাহায্য করতো? তুই নিজে আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাস, তুই ভাবছিস, অজয় আমার সঙ্গে যেতে! মোটেই না!

আমি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মুন্নি বললে, তুই এত ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিস কেন? তোর কী জ্বর হয়েছে?

জ্বর দেখার জন্য মুন্নি আমার কপালে হাত রাখলো। আমার কপাল ঠাণ্ডা, মুন্নির হাতটাই খুব গরম।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, মুন্নি অজয় তোকে ভালোবাসে।

—ছাই ভালবাসে।

—কেন, গঙ্গার ধারে অজয় সেই একদিন তোকে আই লাভ ইউ বলেনি?

মুন্নি খিলখিল করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, নিজেই মুখে হাত চাপা দিল। নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

একটু বাদে বললো, সেই যেদিন তোর দিদির বিয়ে হলো, সেই রাতের কথা বলছিস তো? অজয় আমার সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলো, খালি বলছিল, মুন্নি তোকে একটা কথা বলবো, তোকে একটা কথা বলবো? আমি বলেছিলাম, বল্ না। একটা কেন, যতগুলো ইচ্ছে কথা বল্। কিন্তু অজয় কিছু বললো না। বোধ হয় কী বলবে তা ভুলে গিয়েছিল।

আমি দমে গেলাম খুব। অজয় মুন্নিকে কিছুই বলে নি? তবে অজয় সব কিছুই বানিয়ে বানিয়ে বলেছে আমার কাছে? সেই জন্য আমি নিজে কিছু বলতে পারলম না মুন্নিকে।

কিন্তু অজয় মুন্নিকে যে ভালোবাসে, সে কথা তো ঠিক। মুন্নির জন্য তার ব্যাকুলতা তো মিথ্যে নয়। মুখে বলতে না পারলেও মুন্নিকে সে নিজের বলে মনে করেছে।

—মুন্নি, অজয় কিন্তু সত্যি খুব কষ্ট পাবে তোর জন্য।

—বাজে কথা বলিস না। অজয়ের এখন খেলা ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন নেই। দিন রাত শুধু খেলা নিয়ে মেতে আছে

—খেলাধুলো তো ও বরাবরই ভালোবাসে।

—এখন খেলা ছাড়া আর কিছুই ভালোবাসে না। কলেজের টিমের ভাইস ক্যাপটেন না কি সব হয়েছে, তাই নিয়েই মত্ত। জানিস, ও একদিন আমাকে কি বললো? একদিন আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, আমি অজয়কে বললাম, আমার সঙ্গে গঙ্গার ওপারে যাবি? অজয় বললো, আমার সময় নেই, একদম সময় নেই।

আমি স্তম্ভিত ভাবে বললাম, অজয় সত্যিই বললো এরকম কথা?

—আমি কি মিথ্যে কথা বলছি নাকি। আমি মোটেই পছন্দ করি না ঐ অজয়টাকে।

এও তা হলে সত্যি? যে অজয় মুন্নির জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলেছিল, মুন্নিকে একটু দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো সব সময়, সে এখন মুন্নির সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় পায় না। মানুষ এইভাবে বদলে যায়?

মুন্নি জিজ্ঞেস করলো, বাপ্পা, আমি চলে গেলে তোর কষ্ট হবে?

উত্তর না দিয়ে আমি পাশ ফিরে মুন্নিকে জড়িয়ে ধরলাম। মুন্নির সারা শরীরটা কাঁপছে। কোনো কথা না বলে আমি ওর চুলে হাত বুলোতে লাগলাম। মুন্নি আমার কত আপন।

এই মুন্নি আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে যাবে, একি বিশ্বাস করা যায়!

মুন্নি বললো, আমাকে কেউ ভালোবাসে না। আমি শুধু একজনকে বলেছিলাম আমার চলে আসার কথা। সেও এলো না আমার সঙ্গে।

—কে?

—আমি বলবো না তার নাম।

—কেন, আমাকেও বলবি না?

—না, বলে আর কি হবে? ঠিক আছে, আমি একাই চলে যাবে!

বোধহয় আমিই প্রথম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এক সময় আবার ঘুম ভাঙলো। আমি তখনো মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে আছি। ফিস-ফিস করে ডাকলাম, মুন্নি, মুন্নি!

কোনো উত্তর নেই।

সারারাত জেগে থাকবে বলেছিলো, তবু মুন্নি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি জেগে থাকা যায়?

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক্ষণ। রাস্তা দিয়ে ক্ষীণ আলোর শিখা এসে পড়েছে বিছানায়। সেই আলোতে দেখলাম, মুন্নির গালে শুকনো জলের রেখা। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর মুন্নি একা একা কেঁদেছে। আমারও বুকটা মুচড়ে উঠলো।

ঘুমোলে মুন্নির মুখটা কত সরল আর কোমল দেখায়। সেই জেদী ভাবটা মিলিয়ে যায় একদম। আমার মনে হলো, মুন্নির চেয়ে সুন্দর মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। মুখটা এগিয়ে এনে আমার ঠোঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা করলাম।

মুন্নি তাতেও জাগলো না। সেই প্রথম মুন্নির মুখে আমার মুখ ছোঁয়ানো! আমার মনে হলো, ওর মুখে যেন গোলাপ ফুলের গন্ধ।

সাবধানে ওর পিঠের তলা থেকে আমার হাতটা সরিয়ে

আনলাম। যেন ও জেগে না যায়। আমার দারুণ অস্বস্তি লাগছে। আমি আর শুয়ে থাকতে পারছি না। উঠে বসলাম। সারারাত এইরকমভাবে বসে থাকবো? যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

তা ছাড়া, আর একটা চিন্তা মনে এসে জুড়ে বসলো। সারারাত মুন্নির সঙ্গে এই এক খাটে শুয়ে থাকা—এর একটা অন্য দিক আছে। লোকে আমাদের খারাপ ভাববে।

ভোরবেলা মুন্নি যদি চলে যায়, তা হলে হয়তো কেউ আর জানতে পারবে না। কিন্তু মুন্নি সত্যিই চলে যাবে? ওকে কি যেতে দেওয়া যায়?

মুন্নির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে রইলাম। বারবার মনে হতে লাগলো, আমি ভুল করছি। আমার অন্য একটা কিছু করা উচিত। কলকাতা শহরে কেউ চেনাশুনা নেই, মুন্নির কাছে টাকাকড়িও নেই, সেখানে ওর যে দারুণ বিপদ হবে। না, এ হয় না।

কিন্তু মুন্নি যে-রকম জেদী, ঠিক ভোরে উঠে চলে যাবেই। আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, হয়তো আমাকে না বলেই চলে যাবে। আর আমি যদি জেগে থাকি, তাও কি ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারবো?

আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। এটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি অন্তত আমার আছে যে, সারা রাত এক ঘরে শুয়ে থেকে, সকালবেলা মুন্নিকে জোর করে এখানে আটকে রাখার চেষ্টা করা যায় না। ওকে জোর করে আটকাতে গেলে সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই করতে হবে। তখন সবাই জিজ্ঞেস করবে, রাত্তিরেই সে কথাটা সবাইকে জানাইনি কেন?

খাট থেকে নেমে এলাম আস্তে আস্তে। মুন্নি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটু আগে কেঁদেছে তো। কান্নার পর বেশী ঘুম পায়।

চলে এলাম ঘরের বাইরে। মুন্নি হঠাৎ জেগে উঠে আমাকে পাশে দেখতে না পেলে কিছু একটা করে বসবে না তো! ঘরের

শিকলটা তুলে দিলাম বাইরে থেকে। মুন্নি চট্ করে বেরুতে পারবে না।

পা টিপে টিপে উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। দিদির কাছ থেকে এজন্য আমাকে দারুণ বকুনি খেতে হবে জানি। কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই। মুন্নিকে আটকাবার এই একটামাত্র রাস্তা।

দোতলায় উঠে এসে দিদির ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলাম, দিদি! দিদি!

প্রথমেই কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দেবাশিসদার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এটা জানি, দেবাশিসদার খুব গাঢ় ঘুম, আগে দিদির ঘুম ভাঙবে।

আরও কয়েকবার ডাকতেই দিদি বলে উঠলো, কে?

—দিদি, আমি বাপ্পা? একবার দরজা খোলো।

দিদি ধড়ফড় করে উঠে এসে দরজা খুললো। খুব ভয় পেয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলো, কিরে, কি হয়েছে? শরীর খারাপ হয়েছে? পেট ব্যাথা করছে?

—না।

—তা হলে এত রাত্রে এসেছিস কেন?

চট্ করে উত্তর দিতে পারলাম না।

দিদি বললো, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বল কি হয়েছে?

—দিদি, মুন্নি এসেছে।

—কে? মুন্নি? কখন? আর কে?

—আর কেউ না। একা। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

—এত রাত্রে কী করে এলো? কোথায় মুন্নি?

—খানিকক্ষণ আগে এসেছে, আমার ঘরে শুয়ে আছে। দিদি জ্বলন্ত চোখে আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বললো, কী হয়েছে, সত্যি করে বলতো? কখন এসেছে মুন্নি?

আমার মুখে আর মিথ্যে কথা এলো না। আমি বললাম, তোমরা আসবার একটু আগে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল।

—এ কথা আমাদের আগে বলিসনি কেন?

—ভয় করছিল। যদি তুমি রেগে যাও!

—চল, দেখি—

দেবাশিসদাকে ডাকলো না পর্যন্ত। দিদি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো আমার সঙ্গে।

॥ ১০ ॥

দরজার সামনে এসে দিদি আবার থমকে দাঁড়ালো। দিদির মুখে দারুণ একটা ভয়ের ভাব। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এসে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

দরজার দিকে আঙুল তুলে দিদি জিজ্ঞেস করলো, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া কেন?

আমি নীচু গলায় বললাম, যদি ও হঠাৎ চলে যায়?

—তুই ওকে চিঠি লিখেছিলি? এখানে আসতে বলেছিলি?

—না, আমি লিখিনি!

—তবে ও এখানে এলো কেন?

—জানি না, আমি সত্যিই জানি না। ও নিজের থেকে হঠাৎ চলে এসেছে।

—ছি ছি ছি ছি! এই নিয়ে কত কেলেংকারি হবে!

রাগের চোটে দিদি ঠাস করে আমার গালে এক চড় মেরে বললো, অসভ্য ছেলে, কেন একথা আমাদের আগে বলিস নি। কেন মুন্নি আসা মাত্রই আমাদের খবর দিস নি!

—তোমরা তখন বাড়িতে ছিলে না।

—আমরা বাড়িতে পৌঁছোনো মাত্র কেন বলিস নি?

চুপ করে রইলাম। এ কথার কী উত্তর দেবো। তখন সত্যিই তো বলার কোনো উপায় ছিল না। হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা ঘটলে কী মাথার ঠিক থাকে!

ঝনাৎ করে দিদি দরজার শিকলটা খুলে ফেললো। সেই শব্দেই মুন্নির ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসেছে বিছানার ওপর।

দিদি কিছু বলার আগেই মুন্নি বিছানা থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলো দিদিকে। ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলো, ছোড়দি, তুমি বাপ্পাকে কিছু বলো না! বাপ্পার কোনো দোষ নেই। আমিই সব দোষ করেছি। আমিই বাপ্পাকে বলেছিলাম আমাকে লুকিয়ে রাখতে। ছোড়দি, আমি মরে যাবো, ঠিক মরে যাবো—

মুন্নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এ রকম কান্না দেখে একটু থতোমতো খেয়ে গেল দিদি। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মুন্নিকে কাঁদতে দিল। তারপর আস্তে আস্তে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসালো, খাটের ওপর। নিজে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, কী হয়েছে, আমাকে সব খুলে বল্ তো?

মুন্নি দু'হাতে চোখ ঢেকে রাখা অবস্থায় বললো, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

—কেন?

—আমি ও বাড়িতে আর থাকবো না। ও বাড়িতে আমায় কেউ ভালোবাসে না!

দিদি এবার মৃদু ধমক দিয়ে বললো, বোকার মতন কথা বলিস না মুন্নি? তুই আর অত ছেলেমানুষ নেই। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। হটাৎ কোনো মেয়ে এরকমভাবে বাড়ি থেকে চলে আসে?

মুন্নি চোখ থেকে হাত সরিয়ে স্পষ্ট গলায় বললো, ও বাড়িতে থাকলে ওরা আমায় বিক্রির করে দেবে!

—তার মানে?

—ওরা একটা বিচ্ছিরি বাজে লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে ঠিক করেছে।

কথাটা শুনে দিদি একটু থমকে গেল। মুন্নির মতন একটা দুরন্ত ছটফটে মেয়ে, মাত্র কিছুদিন আগেও যে কিশোরী ছিল—তার হুট করে বিয়ে হয়ে যাবে। এটা বিশ্বাসই করা যায় না। মনটাও নরম হয়ে গেল একটু।

—তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? এর মধ্যেই?

—আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ, তা জানো না?

—আমরাও তো ব্রাহ্মণ, তাতে কী হয়েছে?

মুন্নি চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, কিন্তু আমার বাবা যে মস্ত বড়ো পণ্ডিত! তিনি সব সময় অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্র মেনে চলেন। তাঁর মতে মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা উচিত না! ষোলো বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত।

—তোর ষোলো বছর হয়েছে?

—আর দু'মাস বাদেই হবে।

—বাবাঃ! আজকালও যে এ রকম হয়, তা শুনিনি! মেসোমশাই যে বড্ড রাগী, কারুর কথা শোনেন না!

—কিন্তু তার কথা শুনে আমাকে একটা বুড়ো লোককে বিয়ে করতে হবে?

—ইস, তোর মা বেঁচে থাকতেন—

মুন্নির মায়ের কথা ভেবে আমার নতুন করে দুঃখ হলো। সোনা মাসীমাকে আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যেতে দেখেছি! ও'র জীবনে কোনো সুখ ছিল না। ও'র মুখটা ছিল রান্নাঘরের বাল্‌বের মতন মলিন। কেউ কোনো দিন ও'কে একটা জোরে কথা বলতে শোনে নি। সোনা মাসীমা শেষের ছ'মাস শয্যাশায়িনী ছিলেন।

দিদি আবার বললো, ও রকম একটা বংশে তোর মতন একটা

মেয়ে জন্মালো কী করে সেটাই তো আশ্চর্য। সে যাই হোক, কিন্তু তুই বাড়ি থেকে চলে এসে আমাদের এখানে উঠেছিস, এ কথা জানতে পারলে উনি তো আমাদের উপরেই রাগারাগি করবেন!

মুন্নি চুপ করে রইলো! দিদি যে মুন্নির ওপর প্রথম থেকেই চোটপাট করেনি, এজন্য আমি একটু স্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু দিদি এবার কটমট করে আমার দিকে তাকালো! তারপর মুন্নিকে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুই যে এখানে আসবি, সেকথা বাপ্পাকে আগে জানিয়েছিলি? বাপ্পা তোকে চিঠি লিখতো? চুপ করে আছিস কেন, উত্তর দে!

—ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।

—কোথায় চলে যাবি?

—যেখানে খুশী!

—পাগল নাকি? তোকে আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দিতে পারি?

হঠাৎ দরজার সামনে দেবাশিসদাকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেম, কী ব্যাপার, এখানে কিসের কনফারেন্স হচ্ছে এত রাত্রে?

দেবাশিসদা মুন্নিকে চেনেন। দিদি তাঁকে সব কথা জানালো।

দেবাশিসদা সব সময় মজা করে কথা বলতে ভালোবাসেন। এতবড় একটা ঘটনাকেও কোনো গুরুত্বই দিলেন না।

তিনি বললেন, বিয়ে? মুন্নির বিয়ে? তাও বুড়ো বরের সঙ্গে? এ যে শরৎচন্দ্রের গল্প দেখছি! তা তোমার বরের কটা ছেলেপুলে আছে, মুন্নি?

দিদি বকুনি দিয়ে বললো, তুমি চুপ করো তো! তোমার সব তাতেই ঠাট্টা! মেয়েটা এখন কী করবে বলো তো!

দেবাশিসদা বললেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে যখন, আর ফিরে যাওয়ার দরকার নেই! এখানেই থেকে যাক। বাপ্পার সঙ্গে মুন্নিও পড়াশুনো করবে!

দিদি বললো, মুন্নি এখানেই থাকবে? বললেই হলো?

—কেন, আমাদের তো অনেকগুলো ঘর আছে।

—আঃ, ঘরের কথা হচ্ছে না। কিন্তু মুন্নি এখানে থাকলে ওর বাবা বা দাদারা ছাড়বে কেন?

—তারা মুন্নিকে কেড়ে নিতে আসবে? ঠিক আছে, আমি আর বাপ্পা লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়াবো। কি বাপ্পা, আমরা পারবো না?

—আঃ, তুমি বড্ড ছেলেমানুষের মতন কথা বলো! মুন্নি তো এখনো নাবালিকা, ওরা পুলিশ দিয়ে নিয়ে যাবে!

আমি এবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলাম, ওর বাবা দাদারা ওর ওপর একটা অন্যায় করবে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না?

দেবাশিষদা বললেন, বাবাদের শাস্তি দেবার কোনো আইন নেই। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের ওপর কখনও অন্যায় করবে না—এই কথা ধরে নিয়েই আইনগুলো বানানো হয়েছে। কিন্তু বাবামায়েরা অনেক সময় অন্যায় তো করেই—যেমন ধরো, যে ছেলে ভালো ছবি আঁকতে পারে, তাকে দিয়ে জোর করে সায়েন্স পড়ানো যেমন অন্যায়। মেয়েদের উপর তো আরও বেশী অন্যায় হয়। কিন্তু এ সব কথা তো এখন আলোচনা করে লাভ নেই। এখন চলো ঘুমোনো যাক, কাল সকালে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।

দিদি বললো, চল্ মুন্নি, ওপরে চল্।

দেবাশিসদা বললেন, মুন্নির এ কি পোষাক? বাপ্পার পাজামা শার্ট পরেছে বুঝি? বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু—হো—হো—হো—হো—

হঠাৎ হাসি থামিয়ে দেবাশিসদা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? বাপ্পার সঙ্গে মুন্নির বিয়ে দিয়ে দিলেই তো হয়।

দিদি বললো, আঃ কী আজে বাজে বকছো।

দেবাশিসদা বললেন, কেন, এটাতো বেশ ভালো প্রস্তাব। কাল

ভোরেই একজন পুরুত ডাকিয়ে এনে ওদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারি! মুন্নি যখন পালিয়ে বাপ্পার কাছে চলে এসেছে, তখন ও নিশ্চয়ই বাপ্পাকে খুব পছন্দ করে! একবার বিয়ে হয়ে গেলে আর মুন্নির বাবা দাদারা কিছু করতে পারবে না। ওদের দু'টিতে মানাবেও বেশ। কী বাপ্পা, রাজি?

আমার কাণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। লজ্জায় গলায় স্বরও বুজে এসেছে, প্রতিবাদও করতে পারছি না।

দিদি ধমক দিয়ে বললো, অসভ্যের মতন কথা বলো না। বাপ্পা ছেলেমানুষ......এই মুন্নি চলতো ওপরে—

এরপর সারারাত আর আমার ঘুম এলো না। আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। মুন্নিকে আমরা কী করে বাঁচাবো? মুন্নি তো দূরের কথা, আমিও এখন পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক নই। আইনের চোখে আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দাম নেই!

সকাল ছ'টার সময় তখনও বাড়ির অন্য কারুর ঘুম ভাঙেনি। একটা জিপ গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে। তার থেকে নেমে দুমদাম করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো অজয়। আমি জানালা দিয়েই ওকে দেখেছি।

দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। অজয়ের মুখ খানা অস্বাভাবিক গম্ভীর। চুল উস্কোখুস্কো, চোখের কোলে কালি। ওর ঠোঁট কাঁপছে, যেন কেঁদে ফেলবে, তাই আমাকে দেখে ও একটুক্ষণ কথা বল্‌তে পারলো না।

অজয় সত্যিই মুন্নিকে ভালোবাসে। মুন্নির পালিয়ে অসার কথা শুনে পাগলের মতন হয়ে গেছে। রাত্তিরবেলাই জিপ নিয়ে ছুটে এসেছে এতখানি রাস্তা! অজয় তো জানে না মুন্নি এখানে আছে। ওকে কী দারুণভাবে চমক দেবো আমি।

কিন্তু অজয়ই আমাকে চমকে দিল সংঘাতিকভাবে। শুকনো

গলায় বললো, এক্ষুনি তৈরি হয়ে নে। তোকে বেনারসে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

—বেনারসে? হঠাৎ!

—মন শক্ত কর, বাপ্পা। তোকে খুব খারাপ একটা খবর শুনতে হবে।

খারাপ খবর? আমি তখনও ভেবেছি, অজয় মুন্নির কথাই বলতে এসেছে। সে খবর তো আমি জানিই।

অজয় দুম্ করে বললো, অতনু আত্মহত্যা করেছে!

—অ্যাঁ!

অজয় ভেবেছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। ও আমাকে শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, এখনো মরেনি। হাসপাতালে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তোকে নিতে এলাম।

—অতনু···আত্মহত্যা···কেন?

—জানি না!

—কী করছে? কখন করেছে?

—বিষ খেয়েছে। কী করে বিষ জোগাড় করলো তাও জানি না। চিঠি লিখে রেখে গেছে। তবে ভাগ্যিস কাল রাত্তিরেই সেটা জানা গেল—সেইজন্যই কিছু আশা আছে এখনো, চল, আর দেরি করিস না, যদি শেষ দেখাটাও দেখতে চাস—সেইজন্য আমি এলাম।

অতনু কেন বিষ খাবে? আমাদের বাড়ির কেউ ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? না, না, আমার মা-বাবা দুজনেই তো অতনুকে ভালবাসেন। তবু কেন অতনু মরতে যাবে?

অজয় আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, চল্! কেন দেরি করছিস! দিদি-জামাইবাবুকে শুধু খবরটা দিয়ে আয়।

—মুন্নিকে নিয়ে যাবো না?

—মুন্নি? মুন্নি কোথায়?

—এখানে! তুই জানিস না, মুন্নি পালিয়ে এসেছে!

অজয়ের মুখখানা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে বললো, মুন্নি এখানে? কখন এসেছে?

আমি বললাম, কাল মাঝরাত্রে।

—কার সঙ্গে?

—একা!

অজয় কয়েকমুহূর্ত চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো যেন ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

আবার ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কেন, মুন্নি একা একা এখানে এসেছে কেন?

—তুই জানতিস না যে মুন্নি বাড়ি থেকে পালিয়েছে? তোকে কিছু বলেনি?

—না তো!

—তুই শুনিস নি—জোর করে মুন্নির বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

—না। শুনিনি।

এবার আমার রাগ হলো। কাশীতে থেকেও অজয় এসব কিছু জানে না? খেলা নিয়ে ও এত ব্যস্ত। নিজেরই তো খোঁজ রাখা উচিত ছিল।

অজয়ও বেশ রাগের সঙ্গে আবার বললো, মুন্নি যা খুশী করুক। তুই দেরি করছিস কেন, যাবি না? আর দেরি করলে অতনুকে দেখতেই পাবি না।

এবার আমার চোখে জল এসে গেল। অতনুর কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। অতনু মরে যাবে? এ কখনো সত্যি হতে পারে?

আমি অজয়ের হাত চেপে ধরে বললাম, অজয়, কেন, কেন অতনু আত্মহত্যা করলো? কেন?

অজয় বললো, সে কথা ও কিন্তু লিখে যায়নি, কিন্তু আমি এবার

বুঝতে পারছি। অতনু বাক্স গুছিয়ে রেখেছিল, মনে হয় যেন কোথাও চলে যাবার কথা ভেবেছিল একবার! শেষ পর্যন্ত আর যায় নি। বোধহয় মুন্নির সঙ্গে ওর যাবার কথা ছিল।

—মুন্নির সঙ্গে? কোথায়?

—আমি কি জানি।

—অতনু মুন্নির সঙ্গে এখানে এলো না কেন?

—সে কথা মুন্নিই বলতে পারবে। ওকে জিজ্ঞেস কর না।

আমি নীচ থেকেই চেঁচিয়ে ডাকলাম, মুন্নি মুন্নি—

সেই ডাকের সঙ্গে যেন আমার গলা চিরে গেল। কাল রাতের পর থেকে পরপর এতগুলি ঘটনা যেন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার শরীর কাঁপছে। অতনু যদি মরে যায়? অতনু এতক্ষণ বেঁচে আছে তো? আমার খুব চেনা শুনোদের মধ্যে কেউ মরেনি এ পর্যন্ত। মৃত্যুর অনুভূতি আমি জানি না। অতনু তার বাবাকে আর মাকে মরে যেতে দেখেছে, তবু সে মরতে গেল কেন? মৃত্যুটা কি খুব আরামের? কিন্তু মৃত্যুর পর সবাই তো একেবারে হারিয়ে যায়! হারানো চাবিও অনেক দিন পর হঠাৎ আবার খুঁজে পাওয়া যায়, কিংবা পাওয়া না গেলেও কোথাও কোথাও না লুকিয়ে থাকে। কিন্তু যারা মরে যায়, তারা তো আর কোথাও থাকে না। যারা মরে যায়, তারা নাকি আকাশের তারা হয়ে থাকে। ছেলেবেলা এরকম শুনতাম। কিন্তু তাতেই বা আমাদের লাভ কী! আকাশের তারাকে তো কোনদিন আমরা নাম ধরে ডাকতে পারবো না।

অজয় সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। আমার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে। ওর মুখখানা লালচে হয়ে আছে। খুব বেশী দুঃখ পেলেও অজয় কাঁদে না, রেগে যায়।

অজয় বললো, দেরি করলে আর অতনুকে দেখতে পাবি না!

মুন্নি নিশ্চয়ই আমার ডাক শুনতে পায়নি। ওকে এক্ষুনি ডাকতে হবে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো দেবাশিসদা। আমার দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, এত সকাল সকাল উঠে পড়েছো?

আমি বললাম, অজয় এসেছে।

দেবাশিসদা বললেন, তাই নাকি? মুন্নির খোঁজ নিতে এসেছে বুঝি, ওকে বলে ফেলো নি তো! চট্ করে বলা হবে না, বুঝলে? দু'একদিন সবাইকে সাসপেন্সে রাখতে হবে।

—মুন্নি কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই। কাল রাত্রে তো ভালো করে ঘুমোয় নি।

আমি দেবাশিসদাকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আমি আবার পেছন ফিরে বেখাপ্পা গলায় চেঁচিয়ে বললাম, দেবাশিসদা অতনু আত্মহত্যা করেছে।

দেবাশিসদার হাসি খুশী মুখটা মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল, তিনি ঝড়ের বেগে ওপরে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললে?

আমি বললাম, অতনু—

—মারা গেছে?

—না, এখনো যায় নি বোধহয়···বিষ খেয়েছে···অজয় বললো···

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে দেবাশিসদা বললেন, শার্টটা গায় দিয়ে নাও। এক্ষুনি যেতে হবে বেনারস।

আমি বললাম, অজয় জিপ এনেছে—

—তোমার দিদিকে খবরটা দিতে হবে···দাঁড়াও, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি বলছি···

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন দেবাশিসদা। পেছন পেছন আমিও এলাম। বড় খাটের ওপর পাশাপাশি শুয়ে আছে দিদি আর

মুন্নি। দু'জনেই গাঢ় ঘুমে। দেবাশিসদা খুব আস্তে দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, এই, এই।

দিদি চোখ খুলে তাকাতেই দেবাশিসদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ। মুন্নির ঘুম ভাঙিয়ো না। উঠে এসো, একটা কথা আছে।

দিদি কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কেন? কী হয়েছে? কাশী থেকে কোনো খবর এসেছে।

—হ্যাঁ।

—কী? বাবার কিছু হয়েছে। বাবার হার্টের অসুখ ছিল।

আমি মুন্নির দিকে তাকালাম। আমার পা-জামা শার্ট খুলে ফেলে দিদির একটা শাড়ি পরেছে মুন্নি। চিৎ হয়ে শোওয়া একটা পায়ের পাতা আরেকটা পায়ের পাতার সঙ্গে জড়ানো। দুটো হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। নিমিলিত চোখ দুটি দেখে মনে হয় ধ্যানস্থ।

মুন্নির চোখের পাতা দুটি একবার কাঁপালো। তারপর পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালো।

দেবাশিসদা দিদিকে বললেন, না, তোমার বাবার কিছু হয়নি। উঠে বাইরে এসো, বলছি। মুন্নিকে জাগিয়ো না।

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো উঠে বসলো বিছানায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কে এসেছে? অতনু?

আমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে, দেবাশিসদার দিকে তাকালাম।

দেবাশিসদা বললেন, না, অজয় এসেছে। আমাদের একবার বেনারস যেতে হবে। আমি বাপ্পাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা দু'জনে এখানে থাকো।

মুন্নি খাট থেকে নেমে পড়ে দরজার দিকে দৌড় দিয়ে বললো, আমি যাবো, আমি যাবোই।

দেবাশিসদা খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরে বললেন, তুমি কেন যাবে? তোমার বাড়ির লোক তা'হলে জোর করে তোমায় ধরে রাখবে।

মুন্নি হাত ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললো, আমি যাবোই। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে যেতেই হবে।

মুন্নি মাত্র কাল রাত্রেই বেনারস থেকে পালিয়ে এসেছে। আর আজ সকালেই বেনারস ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত। অতনুর ব্যাপারটা তো ও এখনো শোনে নি!

দেবাশিসদার হাত ছাড়িয়ে মুন্নি দৌড় লাগালো নীচের দিকে। দেবাশিসদা ওকে আবার ধরবার জন্য ছুটে গেলেন। আমিও যাচ্ছিলাম, তার আগেই দিদি এসে আমার চুলের মুঠি ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কী হয়েছে আমাকে বলছিস না কেন? আমি কি ছেলেমানুষ? আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেন? কী হয়েছে, বল আগে!

—অতনু আত্মহত্যা করেছে।

দিদি কোনোদিন অতনুকে ভালোবাসেনি। অতনুকে দিয়ে চাকরের মতন খাটিয়েছে। নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে অনেকবার। কিন্তু এই খবর শুনে দিদির প্রতিক্রিয়া হলো সাংঘাতিক। মুখ-খানা একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় বসে পড়ে ডুকরে উঠে বললো, অ্যাঁ? কী বললি? অতনু…ও মা… অতনু…অতনু…

দিদিই প্রথম কাঁদলো। সে কান্না শুনে আমিও নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু নীচে একটা গোলমাল শুনে আমাদের কান্না থেমে গেল।

মুন্নি হরিণীর মতন তীব্র বেগে ছুটে গেল নীচে। সেখানে অজয়কে দেখেও গ্রাহ্য করেনি। তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে

সে রাস্তা দিয়ে ছুটেছে। দেবাশিসদা আর অজয় দু'জনে মিলে দৌড়ে গিয়ে ধরেছে তাকে। তখন মুন্নি পাগলের মতন করছে, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি বেনারস যাবো।

সত্যিই যেন পাগল হয়ে গেছে মুন্নি। সে দৌড়ে এলাহাবাদ থেকে বেনারস যেতে চায়।

অজয় আর দেবাশিসদা জোর করে ওকে জিপে তুলে নিলেন। আমি এক ছুটে গিয়ে আমার ঘর থেকে একটা জামা নিয়ে এলাম। দিদিও ততক্ষণে নেমে এসেছে নীচে।

জিপ ছুটে চললো বেনারসের দিকে।

॥ ১১ ॥

গাড়ির মধ্যে দিদির শত প্রশ্নেও মুন্নি কোনো উত্তর দিল না। শুধু দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মুন্নিকে এরকম নিঃশব্দ ভাবে কাঁদতে দেখিনি কখনো। মুন্নির কান্না ছিল হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে একটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এখন সে কাঁদছে বড়োদের মত। মুন্নি বড়োদের জগতে চলে এসেছে।

অজয়ের কাছ থেকে টুকরো টুকরো কথা শুনে অনেকখানি বোঝা গেল।

অতনু তার সুটকেস গুছিয়ে রেখেছিল। তৈরী হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মত ঠিক করতে পারেনি। কোথায় যেতে চেয়েছিল অতনু? সে কথা বোঝা শক্ত নয়। মুন্নি বাড়ি থেকে পালাবার কথা শুধু একজনকে জানিয়েছিল। আর কাকে? অতনুকে নিশ্চয়ই। অতনু মুন্নিকে একা ছেড়ে দিতে চায়নি। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই অভিজ্ঞতা নেই অতনুর। সে বইয়ের পোকা, বইয়ের জগত ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার কোমল মনে দারুণ একটা ঝড় উঠেছিল নিশ্চয়ই। পড়াশুনা

ছেড়ে, নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে সে মুন্নিকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? তার সম্বল তো কিছুই নেই। মনের ভেতরের সাংঘাতিক দোলাচল থামাবার জন্য সে হঠাৎ বিষ খায়। কোথা থেকে জোগাড় করলো এমন তীব্র বিষ? এই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। কিন্তু কোনো সমাধানই পাওয়া গেল না। যারা আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খায়, তারা যে সেই বিষ কোথা থেকে পায়, তা কেউ জানে না।

সাড়ে তিন ঘণ্টার রাস্তা জিপটা পেঁাছে গেল পৌনে তিন ঘণ্টায়।

হাসপাতালের ঠিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাবা কথা বলছেন অনিমেষদার সঙ্গে। বাবাকে যেন চেনাই যায় না, একদিনেই অসম্ভব বুড়ো হয়ে গেছেন। চোখ দুটো ভেতরে বসা, গাল চোপসানো। তবু বাবাকে দেখে আমার হঠাৎ এক ঝলক আনন্দ হলো। অতনু নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, অতনু মারা গেলে বাবা এই ভাবে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন না।

আমরা সবাই হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। বাবা স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। তারপর শুধু দিদিকে বললেন, এসেছিস?

দিদি বাবার বুকে মাথা রেখে আবার হু-হু করে কান্না লাগিয়ে বললো, বাবা, অতনু······অতনু······

বাবা বললেন, কাঁদিস না মা। এখনো ওর প্রাণটা আছে, কাঁদিস না।

মুন্নি, অজয় আর আমি ততক্ষণে হাসপাতালের সিঁড়ির দিকে ছুটেছি। মুন্নিই সবার আগে আগে। দূর থেকে অনিমেষদা বললেন, এখন যেও না, এখন দেখতে দেবে না। সে কথা আমরা গ্রাহ্যই করলাম না।

মুন্নি দোতলায় উঠে যাচ্ছিল, অজয় বললো এদিকে, এমারজেন্সি ওয়ার্ড এদিকে······

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোটা মত মেট্রন। দারুণ রাগী রাগী মুখ। তিনি বললেন, উহুঁ, কোথায় যাচ্ছো? এখন না, এখন ও ঘরে যাওয়া নিষেধ, পেসেণ্টের ক্রিটিক্যাল কণ্ডিশান।

আমরা থমকে গেলাম। ওঁর সঙ্গে তর্ক করার সাহস হলো না। কিন্তু মুন্নি ওঁর সামনে এগিয়ে গেল এক পা। মুন্নি এখন আর কাঁদছে না। শান্ত গলায়, প্রায় হুকুমের সুরে সে বললো, আমায় যেতে দিন, আমি একবার শুধু দেখবো।

মেট্রন দু'এক পলক মুন্নির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য, তারপর আর তিনি আপত্তি করলেন না। বললেন ঠিক আছে যাও শুধু একবার দেখেই চলে আসবে। কোনো কথা নয়—

আমরা ভেতরে ঢুকে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম দরজার সামনে। খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে অতনু। চোখ দুটো বোজা। হাত পা ছড়ানো। জীবনের কোনো লক্ষণই নেই। তার নাকের ফুটোয় দুটো নল গোঁজা, শিয়রের পাশে একটা টুলে বসে আছে একজন নার্স। এঁকে আমরা চিনি, বাঙালীটোলাতেই থাকেন, এঁর নাম নীলিমাদি। নীলিমাদি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইসারায় আমাদের বোঝালেন, চুপ, কোনো কথা বলো না।

এমনিতেই আমাদের গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। অতনুর জন্য অসম্ভব কষ্ট হলো, কী অসহায় ভাবে শুয়ে আছে অতনু। তার হাত পা নাড়বার ক্ষমতা নেই। তার মুখটা দেখলেও যেন চেনা যায় না।

আমি আড়চোখে তাকালাম মুন্নির দিকে। মুন্নির চোখের জল শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ ওকে অসম্ভব শান্ত মনে হয়। শুধু ওর চোখ দুটি যেন অন্য জগতের। একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতনুর দিকে। কাছাকাছি যে আমরা আছি বা অন্য কেউ আছে তা যেন ও জানেই না। চোখের পলকও যেন পড়ছে না মুন্নির। আমার ভয় হলো মুন্নি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে কিনা।

একটু পরেই দিদি আর দেবাশিসদা এলেন। মেট্রনের ইসারায় আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মুন্নি আমাদের ছেড়ে আগে আগে হাঁটতে লাগলো। ঠিক যেন ঘোরলাগা মানুষের মতন।

আমি অজয়কে ফিসফিস করে বললাম, মুন্নিকে একটু চোখে চোখে রাখা দরকার। ও আবার কিছু একটা করে না বসে। ও খুব আঘাত পেয়েছে।

অজয় বললো, ওকে এখন তোদের বাড়িতে নিয়ে চল।

কিন্তু সে সুযোগ আমরা পেলাম না। হাসপাতালের গেটের কাছে পেঁছোতে না পেঁছোতেই মুন্নির বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি কী করে খবর পেয়ে গেলেন কে জানে। মুন্নির বাবা এমনিতেই রাগী, বেশী রেগে গেলে তাঁর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

অত লোকজনের সামনেই তিনি মুন্নির চুলের মুঠি চেপে ধরে চিৎকার করে বললেন, হারামজাদী, কোথায় গিয়েছিলি কাল রাত্রে? অ্যাঁ? আমাদের বংশের মুখে চুণকালি দিতে চাস? বল্ কোথায় ছিলি?

তিনি বোধহয় মারধোরই শুরু করে দিতেন। কিন্তু আমার বাবা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, পণ্ডিতমশাই, এসব কী শুরু করেছেন? এতে যে লোক হাসবে। মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যান।

বাবাই একটা রিক্সা ডেকে দিলেন। সেই রিক্সায় মুন্নিকে নিয়ে উঠে পড়লেন তার বাবা। মুন্নি একটুও আপত্তি করলো না।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা কোনো কথাই বললাম না। জলের দিকে তাকিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম। তারপর অজয়ই প্রথম বললো, মুন্নিকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব মারবে, না রে?

আমিও তখন ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিলাম। বললাম, হুঁ।

—ওর বাবাটাকে পুলিশে দেওয়া উচিত !

—হুঁ।

—মুন্নির এ বিয়ে আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। আমি কলেজের ছেলেদের বলে রাখবো, ঐ বুড়ো বর যদি বিয়ে করতে আসে, তা হলে তাকে বেধড়ক ধোলাই দেবো।

—কিন্তু অতনু যদি না বাঁচে ?

—বাঁচবে না কেন ? নিশ্চয়ই বাঁচবে, অতনু থাকবে না, এ কি ভাবা যায় ?

হঠাৎ থেমে গিয়ে অজয় আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর মাটির দিকে মুখ নীচু করে বললো, সবটাই আমার দোষ। বাপ্পা, তুই তো জানিস, আমি মুন্নিকে কতখানি ভালোবাসতাম। কিন্তু সেকথা ওকে কোনোদিন বলতে পারিনি। শেষের দিকে আমি মুন্নির কোনো খবরও নিতাম না। আমি খারাপ, আমি অকৃতজ্ঞ—মুন্নি যদি আমাকে বলতো যে ও অতনুর সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে চায়, আমি ওদের সাহায্য করতাম……আমার জমানো সাড়ে ছ'শো টাকা আছে, দুটো সোনার আংটি আছে, সব অতনুকে দিয়ে দিতাম……জানিস বাপ্পা, অতনুর বদলে আমারই আত্মহত্যা করা উচিত ছিল ?

কিন্তু সেদিনই আমি বুঝেছিলাম যে এ পৃথিবীর অজয়রা সহজে আত্মহত্যা করে না। এমনকি, এ পৃথিবীর বাপ্পারা-ও আত্মহত্যা করার মতন সাহসী হয়ে ওঠে না চট্ করে। শুধু অতনুর মতন ছেলেরাই হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় নিজের প্রাণটা তুচ্ছ করে দিতে পারে।

সেদিন দুপুর থেকে সাররাত আমরা বসে ছিলাম হাসপাতালের মাঠে। অতনুর জ্ঞান ফেরেনি। ঠিক যেন যমে-মানুষে যুদ্ধ চলছিল বেনারসের তখনকার সবচেয়ে নাম করা ডাক্তার ডাঃ গোয়েল অজয়ের বাবার বন্ধু ছিলেন, তিনি নিজে দেখছিলেন অতনুকে। অথচ তিনি নিজেও খুব একটা ভরসা দিতে পারছিলেন না।

পরদিনও সারাক্ষণ আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। স্নান খাওয়া দাওয়া করতেও যেতাম না। সামনের দোকন থেকে কিছু ভাজা-ভুজি এনে খেয়ে নিতাম। মুন্নিকে আর দেখিনি। মুন্নি কী অবস্থায় আছে তাও জানার উপায় নেই। নিশ্চয়ই মুন্নিকে কোনো ঘরের মধ্যে জোর করে আটকে রেখেছে। ইচ্ছে করে এক লাফে গিয়ে মুন্নির বাড়ির দেয়াল ভেঙে মুন্নিকে বার করে আনি। কিন্তু এই সব অবদমিত ইচ্ছে মনের মধ্যে আরও রাগ বাড়িয়ে দেয়।

দু'দিন পর একবার জ্ঞান ফিরলো অতনুর। আমরা দেখা করবার জন্য ছুটলাম। কিন্তু আমাদের বাধা দিলেন ডাঃ গোয়েল নিজে। এই সময়টাই নাকি সবচেয়ে ভয়ের। এই সময় সামান্য একটু উত্তেজনায় রুগীর খুব ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু একটুবাদে ডাঃ গোয়েল নিজেই আমাকে ডেকে পাঠালেন অতনু বারবার আমার নাম করছে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। অজয়কে যেতে দেওয়া হলো না, শুধু একলা আমাকে পাঠানো হলো ঐ ঘরে। যেন আমি বেশী কথা না বলি, সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু সাবধান করে দিলেন আমাকে।

সন্ধে হয়ে এসেছে, জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশ। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল অতনু। আমি চুপচাপ পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। অতনু আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো তারপর হাতটা উঁচু করার চেষ্টা করলো। আমি তাড়াতাড়ি ওর হাতটা ধরলাম।

অতনু আমার হাতটা নিয়ে ছোঁয়ালো ওর গালে। আমি টের পেলাম, ওর চোখের জল পড়ছে আমার হাতে। এই রে, বেশী উত্তেজনায় ওর ক্ষতি হবে না তো।

আমি কোনো রকমে বললাম, আর কোনো ভয় নেই, তুই ভালো হয়ে যাবি!

অতনু বললো, বাপ্পা, শোন্।

আমি মাথাটা নীচু করলাম।

অতনু বললো, বাপ্পা……একটা খবর দিতে পারবি……মুন্নি কোথায়? সে বেঁচে আছে তো?

ঠিক সেই সময় দরজার কাছে একটা শব্দ পেলাম। কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম একটা কালো রঙের শাড়ি পরে এসে মুন্নি দাঁড়িয়েছে সেখানে। চুলগুলো খোলা। যেন সে একটা বন্ধ ঘরের তালা ভেঙে এই মাত্র পালিয়ে এলো।

চোখের ভুল দেখলাম? না তো, সত্যিই তো মুন্নি। সে কি করে এলো, কেউ তাকে আটকালো না?

অতনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিলো, মুন্নি, আমাকে ক্ষমা করো, আমি পারি নি……

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

অতনু সেবার মরেনি শেষ পর্যন্ত। দু তিন দিন যমে-মানুষে যুদ্ধের পর যম ওকে ছেড়ে দিল। অতনু এখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, খুব নাম করা অধ্যাপক।

মুন্নির বিয়ে আমরা সেবার আটকাতে পারিনি! গুরুজনরা বাধা দেয়নি এবিয়েতে, আমাদের কথা কে আর শুনছে! তবু এত খারাপ হয়নি মুন্নির বিয়ে। মুন্নি যাকে বুড়ো বর বলেছিল, সেই ভদ্রলোকের বয়েস আসলে ছত্রিশ। সেই সময় আমরা ছত্রিশ বছরের লোকদেরই খুব বয়স্ক মনে করতাম। এখন নিজেরা ঐ বয়সে পৌঁছে বুঝতে পারি, ছত্রিশ বছর বয়েসটা এমন কিছু খারাপ নয়, নিজেকে একটুও তো বুড়ো মনে হয় না!

মুন্নির বর বেশ ভালোমানুষ। ওরা এখন থাকে লক্ষ্মৌতে। মুন্নির দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে! কিন্তু ওর নিজের মধ্যে সেই ছেলেমানুষ ভাবটা এখনো আছে এক গাদা গয়না পরে বেশ গিন্নি-

বান্নি সেজে মাঝে মাঝে আসে বাপের বাড়িতে। এখনো আমাদের চোখে ওকে ছেলেমানুষই মনে হয়।

অজয় থেকে গেছে বেনারসেই। ইঞ্জিনিয়ারিং গুডসের ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে খুব। মানে আগেও বড়লোক ছিল এখন আরও বড়লোক হয়েছে। অজয় বিয়েও করেছে খুব বড়লোকের মেয়েকে। ওর স্ত্রী এর মধ্যেই বড্ড মোটা হয়ে গেছে।

আমি চলে এসেছি কলকাতায়। বাবা মারা যাবার পর আমাদের বেনারসের পাঠই উঠে গেছে। বন্ধুদের মধ্যে আমিই শুধু জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারিনি। আমি রয়ে গেছি সাধারণ।

দেবাশিসদা বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর এখন চাকরি করেন দুর্গাপুরে। দিদির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। ছেলেবেলায় দিদি আমাদের একদম দেখতে পারতো না, কথায় কথায় মারতো কিংবা বকুনি দিত। এখন দিদি আমাকে আর অতনুকে সাংঘাতিক ভালোবাসে। মাসে একবার দিদির সঙ্গে দেখা না করলে আর রক্ষে নেই। দিদি টেলিগ্রাম করবে কিংবা নিজে ছুটে আসবে! এইজন্য, অতনুকেও প্রায়ই এলাহাবাদ থেকে আসতে হয় দিদির সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে বসিয়ে দিদি নিজের হাতের রান্না করা খাবার খাইয়ে খুব আনন্দ পায়। দিদির প্রথম সন্তান জন্মাবার পর এই পরিবর্তন এসেছে। বাৎসল্য বা স্নেহ জিনিসটা যেন দিদির মনের মধ্যে কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে ছিল—এখন ছাড়া পাবার পর সেটা প্রবল জোয়ারের মতন এসে পড়েছে। আমার সামান্য জ্বর হলেই দিদি দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমোয় না।

দিদির ওখানেই অতনুর সঙ্গে আমার দেখা হয় বেশী। আমরা এখনো অতনুকে সেই আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে খুব খেপাই। অতনু লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা কে আর জানে যে বিখ্যাত

অধ্যাপক অতনু ব্যানার্জি প্রেমের কারণে একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

বেনারসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কমে গেছে। অজয়ের সঙ্গেও বিশেষ দেখা হয় না। তবে কখনো ব্যবসার কারণে অজয় কলকাতায় এলে আমার বাড়িতেই ওঠে। খুব হৈ চৈ করে কয়েকটা দিন। অজয় এখনো সেইরকম আমুদেই আছে।

অজয়ের পর পর দুটি মেয়ে হয়েছিল। তৃতীয়টি ছেলে হওয়াতে অজয় খুব ধুমধাম করে তার মুখে ভাত দিল। সমস্ত বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে গিয়েছিল বেনারসে। আমিও গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকদিন পর মুন্নির সঙ্গে দেখা।

শীতকাল, খাওয়া দাওয়ার পর আমরাছাদে মাদুর বিছিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিলাম। মুন্নি আমাদের পান দিতে এসে বসে পড়লো। তারপর কত গল্প। পুরোনো সেই সব দিন গুলোর কথা ভাবতে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিরশিরে ভাব হয়।

আমি বললাম, তোর মনে পড়ে মুন্নি, এইখানটাতে তুই সেই বাঁদরদের সামনে ছোলা ছুঁড়ে দিয়েছিলি। আমাদের বিপদে ফেলবার জন্য ?

মুন্নি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমরা চারজনেই এখনো বন্ধু আছি।

মুন্নিকে ভালবাসতাম আমরা তিনজনেই। আমরা কেউ মুন্নিকে বিয়ে করিনি, বা করতে পারিনি। তার জন্য কত বছর পর্যন্ত বুকের মধ্যে ব্যথা ছিল।

এখন মনে হয়, ভালই হয়েছে। আমাদের মধ্যে একজন কেউ মুন্নিকে বিয়ে করলে আমরা বোধহয় আর এরকম বন্ধু থাকতে পারতাম না।